বারবধূ

বাইরের বারান্দায় অনেকগুলি [illegible] শব্দ শোনা যায়; তার সঙ্গে একদল মেয়ে ও পুরুষের হাসিখুসী [illegible] আ[illegible]ের কলরব। কারা যেন এসেছে। এইবার কড়া নাড়ছে।

—শুনছেন। এক ভদ্রলোকের গলার স্বর শোনা গেল।

ঘরের ভেতর বসে চমকে উঠলো প্রসাদ। চেয়ারটা ছেড়ে চকিতে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের অবস্থা যেমন অসম্বৃত, তার বুদ্ধিও তখনকার মত তেমনি অপ্রস্তুত। ফাঁপরে পড়লো প্রসাদ। চাপা গলায় আস্তে আস্তে বললো।—যা ভয় করেছিলাম, শেষে তাই হলো লতা। শীগগির ওঠ।

লতা বিরক্ত সুরে মুখ ফিরিয়ে বললো।—[illegible] দিচ্ছে তোমায় কেন? আমি ওসবের কি ধার ধারি?...

তাকিয়ার ওপর এলিয়ে শুয়ে লতা তেমনি নির্বিকারে সিগারেট টেনে চললো। পাশে টেবিলের ওপর একটা বীয়ারের বোতল আর [illegible]

তখনো ছিপি খোলা হয়নি। একটা রেশমী সাড়ী লুঙ্গির মত লতার কোমরে জড়ানো। সন্ধ্যাপ্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে সবেমাত্র বৈঠক বসেছে।

—অন্যায় করছো লতা। ওঠ লক্ষ্মীটি। তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেল। এতে শুধু আমারই মান বাঁচবে তা নয়, তোমারও। একটা ভদ্রতা রক্ষা করে চলতে দোষ কি? ওঠ, কিছুক্ষণের জন্য একটু কষ্ট কর; অনেকক্ষণ ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

লতা উঠলো। প্রসাদ তাড়াতাড়ি বীয়ারের বোতলটা আলমারীতে তুলে বন্ধ করলো। ঘরের দেয়ালে টাঙানো দুটো বড় বড় ছবি নামিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলো। যতদূর সম্ভব ঘরের মূর্ত্তিটাকে দু'চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো প্রসাদ—কোথাও কোন অপরুচির ইঙ্গিত সব সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে যদি লুকিয়ে থাকে। হাঁ, ঐ পর্দাটা—জরির কাজ করা এক জোড়া বিলিতী নগ্নিকা হাওয়া লেগে কুৎসিতভাবে দুলে পড়ছে তখনো। প্রসাদ পর্দাটাকে এক থাবা দিয়ে ধরে, কুঁচকে পাকিয়ে, খাটের তলায় ছুঁড়ে দিল।

প্রসাদ।—এইবার তুমি একটু তাড়াতাড়ি...

লতা।—নাঃ আর পারি না। কী দায় পড়েছে আমার? এই তিন বার বাইরের লোকের কাছে আমায় চণ্ড করতে হলো। সারাটা দিন তো তোমার মানের ভয়ে চাকর বাকরের সামনে একটু জোরে হাসতে কাশতেও পারি না। এতই যদি পারি, তবে তোমার কাছে বাঁধা থাকবো কেন? থিয়েটারে খাটলে দুদশ'শো হতো।

প্রসাদ যত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, লতার উৎসাহ যেন ততই এক নির্বিকার হৃদয়হীনতায় শ্লথ হয়ে পড়ে থাকে। প্রসাদ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের চেহারা শুধু বলছে।—জোর করছি না। দয়া করে উদ্ধার কর।

শেষে লতা ফিক্ করে হেসে ফেলে। প্রসাদের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বললো।—ভুড়ু খাবে খোকা? বুকের পাটা নেই, মেয়েমানুষ রাখতে সখ কেন? শ্যাম রাখি কুল রাখি দুইই একসঙ্গে হয় না।

লতা একটা তোয়ালে আর সাড়ী আল্না থেকে তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে যায়। প্রসাদের বুক থেকে বদ্ধ নিশ্বাসটা মুক্তি পায়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজা খুলে দেয়। জন চারেক প্রৌঢ় বৃদ্ধ ও যুবক, ছ'সাতটি প্রৌঢ়া ও তরুণী আর গোটা দশেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে।

হিলতোলা জুতো আর স্যাণ্ডেলের শব্দ। একপাল ছেলের উল্লম্ফ দৌড়ের হুটোপুটি, সাড়ী আর আঁচলের খস্ খস্, চুড়ির নিক্কন, পাউডার ও এসেন্সের সুবাস—বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চুরুটের ধোঁয়া আর হাতছড়ির ঠুক্‌ঠাক্—বাইরের পৃথিবী থেকে একটা প্রীতি ও সজ্জনতার উচ্ছ্বাস যেন প্রসাদের ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে এসে ছড়িয়ে পড়লো। প্রসাদ হাসিমুখে নমস্কার জানালো।—আসুন।

বেশ লোক এঁরা। ব্যবহারে কোন জড়তা নেই। কেতাদুরস্ত ভদ্রয়ানার বালাই নেই—অপরিচয়ের সঙ্কোচ নেই। বৃদ্ধ রাখাল বাবু গা থেকে আলোয়ানের স্তূপ নামিয়ে খাটের ওপরেই তাকিয়া টেনে বসে পড়লেন। যে যার ইচ্ছামত চেয়ার টেনে নিল। মেয়েরা ব্র্যাকেট থেকে একটা গোটানো সুতির গালিচা নিজেরাই নামিয়ে নিয়ে, মেজে বসে পড়লো।

রাখাল বাবু বললেন।—এইবার তোমার অভিযোগ শুনিয়ে দাও রণজিৎ।

রণজিৎ প্রসাদের দিকে তাকালো।—সত্যি মশাই। আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক বলবার আছে। আমরাও আপনার মতই এখানে চেঞ্জে

এসেছি। এই তো ক'ঘর মাত্র আমরা; এ ছাড়া আর কোন বাঙালীর মুখ দেখতে পাই না। আমরা খুঁজছি কি'করে দল ভারী করি, আর আপনি বেমালুম ডুব দিয়ে আছেন।

প্রসাদ সলজ্জভাবে স্বীকার করে নিল—হঁা, এটা অন্যায় হয়েছে।

মেয়েদের দল থেকে প্রথম কথা বললো আভা—রণজিতের বোন।

—বড়দা, তোমরা তো এরই মধ্যে নিজেদের দল ভারি করে ফেললে। আমরা কি করি? ভেতর থেকে তো কারও কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

প্রসাদ তেমনি লজ্জিতভাবে হেসে হেসে বললো।—একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি আসছেন।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো লতা। চওড়া-পাড় একটা তাঁতের সাড়ী পরেছে। সামনেই বুড়ো রাখাল বাবুকে দেখতে পেয়ে লতা থমকে দাঁড়িয়ে মাথার কাপড়টা আরও একটু সামনে টেনে নামিয়ে দিল। সিঁথিতে লম্বা সিঁদুরের টান; পায়ে জুতো নেই—তাই দেখা যায় সরু আলতার রেখা।

লতাকে দেখবার পর প্রসাদের মুখের ওপর থেকে এতক্ষণের ভীরু কাতরতার খিন্ন ছায়াটুকু সরে গেল। কথাবার্ত্তায় সহজ স্ফূর্ত্তি ফিরে পেল প্রসাদ।

আভা লতাকে হাত ধরে গালিচার উপর বসাবার জন্য একবার টানলো। লতা বললো।—ভেতরে চলুন।

বাইরের ঘরে ও ভেতরের ঘরে অনেকক্ষণ অবাধ গল্প, তর্ক ও হাসির পালা গড়িয়ে চললো। ছেলেপিলেরা দু'বার মারামারি বাধালো। তাদের থামাতে গিয়ে বুড়োরা গোলমাল করলো আরও বেশী। আজ দেড়মাসের মধ্যে বরাকর কলোনীর একান্তে এই নিরালা বাংলো বাড়ীটার কোন সন্ধ্যা এত সজীব হয়ে ওঠেনি।

লতা অভ্যাগত সকলকেই আপ্যায়ন করার জন্য খাবার তৈরী করবার

উদ্যোগ করছিল। মেয়েরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করে থামিয়েছে—শুধু চা হলেই হবে।

লতা বললো—কিন্তু ছেলেরা কি খাবে? শুধু চা? তা হতে পারে না।

লতা প্রায় রাগ করে বসলো।—দেখেছেন তো ওদিকে মশায় কেমন নিশ্চিন্ত মনে শুধু কথা দিয়ে চিঁড়ে ভেজাচ্ছেন। এদিকে কোন হুঁস নেই, খোঁজখবর নেই।

মেয়েরা হেসে উঠলো সবাই।—তা আপনি হিংসে করছেন কেন?

আভা হঠাৎ নিজের খেয়ালেই বাইরের ঘরে এসে বললো।—বৌদি রাগ করছেন। ভেতরে কত কাজ রয়েছে, আর আপনি সব ভুলে গল্পে ডুবে আছেন।

প্রসাদ।—কেন কি ব্যাপার?

আভা।—স্বয়ং এসে খোঁজ নিন।

লতাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। দরজার আড়ালে ভেতরের দাওয়ায় অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। প্রসাদ ভেতরে আসতেই ফিস্ ফিস্ করে লতা বললো।—চা না হয় হলো, কিন্তু ছেলেপিলেদের কি দেব? তুমি একবার বাজার ঘুরে এস, কিছু মিষ্টি টিষ্টি......।

আভা এবং আরও দু'টি তরুণী একটু দূরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে প্রতিবাদ করলো।—বৌদি বড় বাড়াবাড়ি করছেন।

প্রসাদ বললো।—বিস্কুটের টিনটা খুললে হয় না? নইলে বাজারে অবশ্য যেতে হয়।

লতা বললো।—তাইতো, মনে ছিল না। যাক্, ওতেই হবে।

মেলামেশার পাট ক্ষান্ত হলো রাত্রি দশটায়। তার আগে প্রসাদকে গাইতে হলো; ঘরের কোনে শালুর খোলে ঢাকা এস্রাজটা গুণী প্রসাদের পরিচয় জাহির করে দিয়েছিল।

রাখাল বাবু আলোয়ানটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালেন আবার। রাখাল বাবুর স্ত্রী, মেয়েরা এঁকে মাসীমা বলে ডাকছিল, পায়ের মোজাটা টেনেটুনে ঠিক করলেন। ফোলা ফোলা পা দুটোতে বেরিবেরির নিদর্শন স্পষ্ট। তারক বাবু নতুন চুরুট ধরিয়ে হাতছড়িটা আবার ঠুকলেন—একা আভা ছাড়া তিনটি মেয়েই তাঁর ভাগ্নী, ভাইঝি আর শ্যালিকা। ছেলেপিলেদের মধ্যে চারজন রাখালবাবুর নাতি—বাকী সবকটি হরিশ বাবুর। হরিশ দম্পতি আজ অনুপস্থিত—তাঁরা বাতের প্রকোপে এখন শয্যা আশ্রয় করে আছেন।

রাখাল বাবু বললেন।—তা হ'লে এইবার তোমায় মুক্তি দেব প্রসাদ বাবু। রাত হলো অনেক। আমরা উঠি।

বিদায় প্রসঙ্গে আর একবার আলাপ বার্ত্তায় কলগুঞ্জন মুখর হয়ে উঠলো। প্রসাদ ফটক পর্য্যন্ত লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল।। লতা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইল ছায়ার মত।

—আঃ বাচা গেল! বীয়ারের বোতলটা আবার টেবিলের ওপর নামালো প্রসাদ। শরীরটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল লতার—খাট বিছানার ওপর একটা বালিশ আঁকড়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

কিন্তু প্রসাদের গলার স্বরে স্ফূর্ত্তি চড়ে উঠেছে।—এ কি? উঠে বসো। এ সময় বে-রসিকতা করো না মাইরি!

লতা কোন সাড়া না দিয়ে তেমনি নিঝুম হয়ে শুয়ে রইল। প্রসাদ হাত ধরে টানাটানি করতেই উঠে বসে রুক্ষস্বরে বললো। —যখন তখন অসভ্যতা করো না।

প্রসাদ।—বেশ বেশ, করবো না। যাও এবার চট্‌পট্ এই আল্‌তা কাল্‌তা সাজসজ্জা বদলে এস। এক পাত্র চড়িয়ে নিয়ে বসা যাক জুৎ করে।

লতা।—এরকম ক্যাংলাপনা করছো কেন? কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

পাশের ঘরে চলে গেল লতা। তাঁতের সাড়ী ছাড়লো, আলতা সিঁদুর মুছে ফেললো। আকস্মিক একটি সন্ধ্যার কপট বধূবৃত্তির নির্মোক ঘুচিয়ে, পায়জামা পরে চটি পায়ে দিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকলো।

প্রসাদ খুসীতে আটখানা হয়ে গেল।—বাঃ, সত্যিই তোমাকে ফাইন মানিয়েছে এইবার।

লতার কানে যেন কথাটা গেল না; ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো লতা। দূরে বরাকরের পুলের ওপরে একটা আলোর সারি মিট মিট করছে। আর কিছুই দেখা যায় না। একটা কর্কগাছের তলায় স্তূপীকৃত বাসি ফুলের পচাটে উগ্র গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। লতা লম্বা লম্বা টান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ভরে নেয়—আস্তে আস্তে ছাড়ে

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদের যেন চমক্ ভাঙলো। দ্বিতীয় বীয়ারের বোতলটা শেষ হয়েছে। লতা তখনো জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। প্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো। তার পর বকে চললো নিজের মনে, স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে।—বেশ, বেশ! ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক। দূরের বন্ধু দূরেতে রহ। কিন্তু তুমি বাবা পাকা খেলোয়াড়। এতগুলি ভদ্র নরনারীকে দিনে তারা দেখিয়ে দিলে বাবা। তবু থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্। আমার মান বাঁচিয়েছ। তোমাকে বখশিস্ দেব। আসছে বছর কাশ্মীর। কিন্তু……কিন্তু তুমি আমাকে এই মাত্র অসভ্য বলেছ। ইউ ভ্রষ্টা—মুড়িওয়ালীর বাচ্চী। আমি তোমাকে জুতিয়ে……।

টেবিলটা একটা ঠেলা মেরে উল্টে দিয়ে সরোষে দাঁত ঘসে প্রসাদ একটা হুমকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

লতা এইবার মুখ ফিরিয়ে দেখলো। কিন্তু কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল

না। শান্ত ও সহজ অথচ দৃঢ় স্বরে বললো।—হঠাৎ এত উৎসাহ জেগে উঠলো কেন? বসো বলছি।

এগিয়ে এসে আলমারী থেকে আর একটা বীয়ার বার করে গ্লাস ভর্ত্তি করে প্রসাদের সামনে ধরলো লতা। প্রসাদ ঢক ঢক করে খেয়ে চোখ বুঁজে অলসভাবে হাত বাড়ালো সিগারেটের জন্য।

প্রসাদের মেজাজ কুলকাঠের আগুনের মত তবু যেন থেকে থেকে সশব্দে ছিটকে পড়ছিল। লতা খুব ভাল করেই এ-রোগের ওষুধ জানে। এখনি প্রসাদের কোলের ওপর পা দুটো চড়িয়ে দিয়ে একটু ফষ্টি করা যায়—দুটো ছড়া গেয়ে ওঠে, ঐ মেজাজের আগুন ঠাণ্ডা ছাই হয়ে উড়ে যেতে কতক্ষণ?

প্রসাদ লতার মুখের দিকে তাকিয়ে, বড় বড় চোখ করে, একটা দৃপ্ত ভঙ্গী এনে বললো।—যেমন রেখেছি তেমনি থাকবে!

লতা।—বলেছি তো, তাই থাকবো।

প্রসাদ।—তবে এত পোজ করছো কেন? তুমি তো বাঁধা মেয়েমানুষ মাত্র।

লতা।—তা তো জানিই।

প্রসাদ।—তুমি আভার চাকরাণী হবারও যোগ্য নও।

হঠাৎ আগুনের ঝাপটা লেগে যেন লতা ছটফট করে উঠলো। এতক্ষণ প্রসাদের এই বকাবকিকে নেশাড়ি মানুষের মূঢ়তা মনে করেই চুপ করেছিল। কিন্তু এই কথাগুলির ভেতর দিয়ে একটা অতি সূক্ষ্ম সত্যের ইঙ্গিত যেন ঝিলিক দিয়ে গেল। প্রসাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে তার মুখের ওপর কঠোরভাবে তাকিয়ে রইল লতা। কিন্তু লতার ক্ষোভ শুধু ফণা তুলে দাঁড়ালো মাত্র। ছোবল আর পড়লো না। লতা সরে এসে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দিল। শুধু

বললো। —তোমার কাছে বাঁধা থাকতে আমার কোন গরজ নেই। আমি কালই ফিরে যাব তারকেশ্বরে।

অনেক রাত্রে একটানা স্তব্ধতার পর লতার ঘরের কড়া বেজে উঠলো আবার। নেশা কেটে যাবার পর প্রসাদের মনের অবসাদের মধ্যে সেই ভালমানুষী ভীরুতা যেন আবার সতর্ক হয়ে উঠলো। লতাকে সে ভাল করেই চেনে। এসব মানুষকে চটিয়ে লাভ নেই। জীবনের চোরাঘরে ওরা পাপের সঙ্গে চুক্তি করে চলে। বাইরের আঙিনা, যেখানে আত্মীয়তার মেলা, সেটা ওদের কাছে বিদেশের মত দুর্ব্বোধ্য। তার মর্য্যাদা দেবার মত কোন দরদ ওদের নেই। লোকসমাজে প্রসাদের মান মর্য্যাদার জন্য কতটুকু মাথাব্যথা লতার ? কাল সকালেই যাবার আগে হয়তো বরাকর কলোনীর প্রতিটি প্রাণীকে জানিয়ে দিয়ে যাবে নিজের পরিচয়, আর সেই সঙ্গে প্রসাদের এত যত্নে গড়া সুনামের সামাজিক স্বাক্ষরে কালি ঢেলে দিয়ে যাবে।

প্রসাদ বাইরে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বললো।—লতা, বল তুমি রাগ করনি, তবে আমি ঘুমোতে যাব। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। বল, তা না হলে আমি এখান থেকে নড়বো না।

প্রসাদ বারবার কড়া নাড়তে লাগলো। ঘরের ভেতর থেকে লতার শান্ত কণ্ঠস্বরের জবাব এল।—না, আমি যাব না। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

—চাচিজী!

বারান্দা থেকে ডাকছে বিক্রম। সুবেদার বাবুর ছোট ছেলেটা। মেজের ওপর বিক্রমের লাট্টু মাঝে মাঝে ধর্ ধর্ করে চক্কর দিচ্ছে শোনা যায়। ঘুম ভাঙতেই প্রসাদ বুঝলো ভোর হয়ে গেছে।

কদিন থেকে রোজ প্রত্যুষে ছেলেটা আসে। লতার সঙ্গে চা পাউরুটী খায়। তার পর কিছুক্ষণ পেঁপে গাছটার নীচে মাটী দিয়ে কেল্লা তৈরী করে,

পেঁপে ভাঁটার তোপ দিয়েই শেষে উড়িয়ে দিয়ে বাড়ী চলে যায়।

গত রাত্রির ঘটনাগুলি ভাঙা স্বপ্নের মত আবার চেতনায় জোড়া লেগে সমস্ত ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রসাদ বুঝতে পারছিল—পাশের ঘরে লতা জেগে উঠেছে, কাপড়চোপড় ছাড়ছে। এইবার বাইরের ঘরের খিল খুলছে লতা। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। লতা বলছে।—এস বিক্রম।

বিক্রম যেন অনুযোগ করে বললো।—কিত্না নিঁদ যাতে হো চাচিজী!

প্রসাদ শুয়ে শুয়ে সবই অনুমান করে নিতে পারছিল। মহাবীর চাকরটাও বোধ হয় এসে গেছে। ঝাড়ু দেবার শব্দ শোনা যায়। তার পর? তার পর মহাবীর চা নিয়ে আসবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। তার পর আরও দেখতে হবে—লতা সুগৃহিণীর মত সারা দুপুর মহাবীরের কাজ তদারক করছে। ভাঁড়ার খুলে হিসেব করে বি-ময়দা বার করছে। তার পর খাওয়া। লতা তখন স্নান সেরে মহাবীরের সঙ্গে ধর্ম্মশালার মন্দিরে প্রসাদ আনতে যাবে। এক কৃত্রিম সংসারের শিবিরে, সমস্ত দিন ধরে এই নিয়মিত কর্ত্তব্যের সাধনা। প্রেরণা নেই, তবু যেন নিজের দমেই চলে। প্রসাদের মন যেন ক্লিষ্ট যাত্রীর মত এই খাপছাড়া মুহূর্ত্তগুলির চাকার ওপর দিয়ে ধৈর্য্য ধরে গড়িয়ে চলে যতক্ষণ না সন্ধ্যে হয়, গন্তব্যে এসে পৌঁছে। তখনি শুধু লতাকে কাছে পাওয়া যায় আর চিনতে পারা যায়। তার আগে, এতক্ষণ সে বাংলো বাড়ীর হাওয়া থেকে উপে যায়।

বিক্রম যায়, যেতে না যেতে হয়তো লালাবাবুর স্ত্রী এসে বিশ্বসংসারের কাহিনী নিয়ে বসেন। লালাবাবুর জামাইটির চাকরী নেই—মেয়েটা দুঃখে আছে। কাহিনী শুনে লতার মুখ ম্লান হয়ে যায়। মনে হয়, দুঃখটা যেন ওরই সবচেয়ে বেশী।

সমস্ত ঘটনাগুলিই প্রসাদের কাছে আজ কেমন গর্হিত মনে হয়। এত বড় একটা ফাঁকি সত্যের সাজ সেজে থাকবে—আলো-অন্ধকারের তফাৎ-টুকুও যে মিথ্যে হয়ে ওঠে।

রাখালবাবুর বেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে এল। —প্রসাদবাবু, লতাকে আজ বিকেলে একবার পাঠিয়ে দিও। আজ রাত্রে এখানেই দুটো ডালভাত খেয়ে ফিরবে। ইতি—মেশোমশায়।

আজকের সকালে লতার মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে আছে। মাঝে মাঝে অকারণে ভয় লাগছে; কিসের জন্য এবং কেন, লতা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এ রকম কোনদিন হয়নি। নইলে তাকে গালাগালি দিয়ে সেরে যাবে, এমন কোন জমিদারের বেটা আজও সে দেখেনি। কিন্তু নিজের মনের দিকেই চেয়ে সে আশ্চর্য্য হলো, কালকের রাত্রির ঘটনা নিয়ে বিতণ্ডা করার মত উৎসাহ যেন সেখানে আর নেই।

লতার বুঝতে দেরী হলো না—এটা ভয় নয়, দুর্ব্বলতা। কিন্তু দুর্ব্বলতাই বা কেন?

এই এলোমেলোর ভাবনার মধ্যেই লতার মন ধীরে ধীরে আবার হিংস্র হয়ে ওঠে। তাড়িয়ে দেবে? দিক্ না, তাতে ক্ষতি কি? সেই মাড়োয়ারী বেণিয়াটা এখনও আছে, তু করে ডাকলেই চলে আসবে। কিন্তু যাবার আগে এই ভালমানুষের ছেলেকে এমন শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে, জীবনে আর বেশ্যার সঙ্গে বেয়াদবী করার দুঃসাহস হবে না।

—লতা।

প্রসাদের ডাক শুনে লতার বুকটা তবু আশঙ্কায় ছমছম করে উঠলো।

প্রসাদ এগিয়ে এল। লতা মাথা নীচু করে মসলা বেছে চললো।

—রাখালবাবুর বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন। যাবে ?

চোখ তুলে তাকালো লতা। আশঙ্কার ঝাপসা পর্দাটা সরে গেল। বললো—যাব।

—যাও, কিন্তু কোন বেয়াড়াপনা যেন টের না পায়।

নাটকের সীন পাল্টে গেছে। নতুন দৃশ্যের আরম্ভ—এ যেমন অদ্ভুত তেমনি জটিল। শুধু লতা নয়, প্রসাদও তার সংগুপ্ত জীবনের পরিধি অতিক্রম করে বহুমানুষের মেলামেশার প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যেগুলি প্রসাদের বেশীর ভাগ আভাদের বাড়ীতে কেটে যায়। লতা যায় রাখালবাবু, তারকবাবু ও হরিশবাবুর বাড়ী। তাছাড়া সুবেদার ও লালাজীর বাড়ীও আছে ; শুধু আজ পর্য্যন্ত আভাদের বাড়ী লতার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বার বার দু'বার নেমন্তন্ন এসেছে—কিন্তু দুদিনই হঠাৎ কেন জানি লতার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিন জ্বর আর একদিন মাথাধরা।

প্রসাদ খুব খুসী হয়ে বললো।—সত্যিই তোমার বাহাদুরী বলতে হবে। যেখানে যাই, সবারই মুখে তোমার প্রশংসা আর ধরে না দেখছি। কী চালই চেলেছ লতা।

উত্তরে লতা চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।

প্রসাদ আবার বললো।—দেখো যেন বেশী বাড়িয়ে তুলো না।

লতা।—বাড়িয়ে তুললে, তোমারই মান বাড়বে।

প্রসাদ হেসে ফেললো।—সত্যিই কী যে কাণ্ড হচ্ছে ! এক এক সময় যা ভয় করে আমার। যদি একবার ধরা পড়ে যাও লতা, কী ব্যাপার হবে বল তো ?

লতা।—আমার আর কি ছাই খোয়া যাবে ? বনের পাখী বনে ফিরে যাবো, বাস্।

প্রসাদ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়লো। অন্যমনস্কের মত বলতে বলতে চলে গেল।—হাঁ, তোমার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু……।

আভা আরও দু' তিন দিন প্রসাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। কথা বলেছে লতার সঙ্গে, কিন্তু প্রথম দিনের সেই সহজ স্বচ্ছতা তার মধ্যে ছিল না। পরিচয় যত পুরণো হয়েছে—ব্যবধান বেড়ে গেছে তত। লতাও ঠিক সহজভাবে মিশতে পারেনি। কথা বলেছে লতা, কিন্তু তাল কেটে গেছে বার বার। চা এনে আভার সামনে ধরেছে—আভা আপত্তি করলেও সাধাসাধি করতে পারেনি লতা। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

প্রসাদ আর লতা। যখন এরা দুজন শুধু থাকে, তখনই এদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কথাবার্তা বিরল থেকে বিরলতর হয়ে এসেছে। লতা বেড়িয়ে এসে দেখে—প্রসাদ তখন ফেরেনি। প্রসাদ বাইরে থেকে মাঝে মাঝে ফিরে এসে দেখে—লতা ঘুমিয়ে পড়েছে তার ঘরের দরজা বন্ধ।

ভদ্রলোকদের বাড়ীতে মেয়েদের গল্পের আসরে লতার প্রসঙ্গ এক-একবার ওঠে। মাসীমা বলেন—মেয়েটা বড় শান্ত।

তারকবাবুর মেয়েরা—নিভা প্রভা ও মমতা একসঙ্গে সায় দিয়ে বলে—লতাবৌদি বেচারা সত্যি ভালমানুষ। আভা মিছামিছি ওর নিন্দে করে।

মাসীমা।— আভা কী বলেছে ?

মমতা।—লতাবৌদি নাকি লেখাপড়া জানে না। একেবারে গেঁয়ো—গাঁয়ের মেয়ে।

মাসীমা চটে উঠলেন।—আভা নিজেকে কী মনে করে ? ভয়ঙ্কর বিদুষী ? মর ছুঁড়ি, বিয়ের ছ'মাস না যেতে স্বামী হারিয়েছিস—বিদ্যে নিয়ে ধেই ধেই করছিস। লজ্জাও করে না।

নিভা প্রভা হেসে উঠলো। আভার ওপর মাসীমার আক্রমণের একটা অর্থ হতে পারে—মাসীমাও গাঁয়ের মেয়ে।

লালাজীর স্ত্রী এসেছেন। লতা তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করছে। বাইরের ঘরে গল্প করছে আভা প্রসাদের সঙ্গে।

প্রসাদ বেশ জোরে জোরে যেসব কথা বলে, শুনে আভার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। ঘন ঘন দরজার দিকে তাকায়। ভুরু কুঁচকে ভর্ৎসনার সুরে বলে।—আপনার কোন ভয়ডর নেই প্রসাদবাবু!

একটু পরেই বোঝা গেল, আভা ও প্রসাদ বেড়াতে বার হয়ে যাচ্ছে। লালাজীর স্ত্রী বোকার মত লতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন।—ও ছোকৃরি কে লতা? ওর চালচলন ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি একটু কড়া হও লতা।

লতা বললো।—আমি ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে—আমার স্বামীও ঠিক থাকবে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

লালাজীর স্ত্রী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন।—তা বটে।

কিন্তু লতার নিজের কথার প্রতিধ্বনি তার অন্তরের ভেতরে প্রচণ্ড বিদ্রূপের মত বেজে উঠলো। হাসছিল লতা।

প্রভার স্বামী এসেছে—প্রভাকে নিয়ে যেতে। তারকবাবুর বাড়ীতে তাই আজ লতা ও প্রসাদের নেমন্তন্ন ছিল। সব মেয়েদের মত লতাও জামাইয়ের সঙ্গে গান গল্প ও ঠাট্টা নিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসলো। বিদায় নেবার সময় প্রসাদ দেখলো, প্রভার স্বামী লতাকে পা' ছুঁয়ে প্রণাম করছে। প্রসাদের সারা মনটা একটা অপঘাতে যেন ছিঁড়ে পড়লো।

পথে আসতে লতাকে গম্ভীরভাবে প্রসাদ বললো।—সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

লতা উত্তর দিল না।

প্রসাদ বললো।—এই পাপ আমার লাগছে। তোমার কিছু হবে না।

প্রসাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারলে খুসী হতে পারতো লতা। সব পাপ প্রসাদের জীবনের অভিশাপ বড় করে তুলুক, লতা তাহ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু এতটা সৌভাগ্য বিশ্বাস হচ্ছিল না লতার। তাই লতার বুকের সংশয়ে ভেতরটা শিউরে উঠছিল। এই প্রথম নিজেকে অপরাধী ও অশুচি মনে করলো লতা। প্রসাদের অনুমান সত্য হলে আশ্বস্ত হওয়া যেত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিরীহ নির্দোষ মানুষের হৃদয়ের প্রীতিকে এত বড় ফাঁকি দেওয়া পাপ বৈকি। সে পাপের ভাগী কি সে নিজেও নয়? কিন্তু কোন্ স্বার্থের খাতিরে? প্রসাদের মানের জন্য?

লতা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়েও হেসে ওঠে। আরও বেশী করে হাসি পায় প্রসাদের ভাগ্যবিপাক দেখে।

ঘরে ফিরে প্রসাদ আবার কথা পাড়লো। কথার খাপছাড়া ভঙ্গীতে বোঝা যায়, অনেক কিছু সে বলতে চায়; কিন্তু বলতে পারছে না, সে সাহস তার নেই।

প্রসাদ বললো।—আজকাল দেখছি ঘরের ভেতরেও বড় শুদ্ধাচার চালিয়েছ। এখানে তো তোমায় কেউ দেখতে আসছে না। তবে এখানেও ক'নে বউটি সেজে থাক কেন?

লতা। —কই, তুমি তো আজকাল কাছে ডাক না।

প্রসাদ। —আমি না ডাকলে তোমার তাতে কি আসে যায়? প্রয়োজন থাকলেই ডাকবো। কিন্তু তুমি সিগারেট ছেড়ে দিলে কেন?

তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। তোমার এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

লতা।—তোমাকেও কোন উপদেশ দিতে হবে না। যেমন ইচ্ছে তেমনি থাকবো।

লতার এই উদ্ধত উক্তি প্রসাদকে অপমান করলো ঠিকই; কিন্তু তার বিভ্রান্ত ও অসহায় চিত্তের অলিগলি ঢুঁড়ে সে এমন কোন মুক্ত আশ্রয় পেল না, যেখানে এসে লতাকে উপেক্ষা করা যায়। তার সম্ভ্রমভীরু মনুষ্যত্বের চাবিকাঠিটুকু যেন লতা হাত করে ফেলেছে।

লতা সত্যিই বেপরোয়া হয়ে গেছে। আভার কথা মনে পড়লো হেসে ফেলে। তার একটা মেকী আধুলি চুরি করে আভার যদি কিছু লাভ হয়, হোক। তার কিছুই হারাচ্ছে না। কেউ তার কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। এমন কি প্রসাদেরও সে ক্ষমতা নেই। লতার নামের দাবী সবাকার স্বীকৃতির জোরে সব ছাপিয়ে গেছে।

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না। বাহির যার এত বিচিত্র, অন্তর শূন্য থাকলে ক্ষতি কি? লতার দিনগুলি এই আশ্বাসে ভরে উঠছিল। চোরাবালির ওপর কত বড় দালান তোলা যায়, প্রসাদ ও লতার সংসার তার প্রমাণ।

আভার জ্বরের খবর শুনে প্রসাদ সেই যে সকালবেলা বার হয়েছিল, ফিরে এল এই সন্ধ্যায়। আভার জ্বরের সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার মত আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে—শুধু অকারণ কান্না। রণজিৎ বলেছে, আভার জ্বর আগেও হয়েছে, কিন্তু এসব উপসর্গ কখনও ছিল না।

লতা সন্ধ্যেমাত্র বেড়িয়ে ফিরেছে। প্রসাদ ঘরের ভেতর একা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। চারিদিক থেকে একটা বিকৃত বিভীষিকা তাকে যেন চেপে ধরেছে।

অনেকদিন পর প্রসাদ কথা বললো।—তুমি বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছো। আভার নামে নিন্দে রটাবার সাহস পেলে কোথায় ?

লতা।—নিন্দে ? আমি আভার নামে কোথাও কিছু বলিনি।

প্রসাদ। —সেটাও একরকমের নিন্দে ও অপমান করাই হলো।

প্রসাদের কথাগুলির মধ্যে উত্তেজনা ছিল না। মেজাজও আগের মত দপ করে জ্বলে ওঠে না। বিচারকের রায়ের মত অবিচল সিদ্ধান্তে তীক্ষ্ণ ও শান্ত।

লতা। বল, কি করবো ?

প্রসাদ। না, তোমাকে দিয়ে আর বেশী নাটুকে খেলা করাতে চাই না। অনেক করেছ, বেশ ভালভাবেই করেছ। কিন্তু তোমার দিক থেকেই ভেবে দেখ—চিরকালই তো এমনিভাবে চলতে পারে না; তাতে তোমারই বা কী লাভ ?

প্রসাদ আরও প্রস্তুত হয়ে নিল।—তারপর, আজ যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, তুমি কী বস্তু ? তাহলে আমি কোথায় থাকি ? তুমি আমার মানমর্য্যাদার চাবিকাঠি আগলে বসে থাকবে, তা হয় না। তোমাকে ভয় করে চলতে হবে—তোমার মেজাজ মরজির দিকে সব সময় সশঙ্কভাবে চেয়ে থাকতে হবে—তা হয় না।

লতা টেবিল ল্যাম্পটার দিকে তেমনি একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছিল। কথা বলতে সেও জানে—কিন্তু এই অভিযোগ খণ্ডন করার মত যুক্তি তার নেই—তার সে শিক্ষাদীক্ষা নেই। সে প্রয়োজনও কখনো হয়নি।

প্রসাদ বললো।—তোমার চলে যাওয়া উচিত।

লতার শরীর পাথরের মূর্ত্তির মত তেমনি স্তব্ধ হয়ে রইল।

—তোমার যা পাওনা হয়েছে, সব মিটিয়ে দিচ্ছি—আরও কিছু দেব।

লতা অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আস্তে আস্তে বললো।—কিন্তু তারপর আমার চলবে কি করে ?

প্রসাদ এইবার মেজাজ হারালো।—সেটা কি আমার ভাবনা? ভুলে গেছ, এখানে এসে প্রথম দিন তোমায় রাঁধতে হয়েছিল বলে কি কাণ্ড করেছিলে? বাক্সপেঁটরা নিয়ে ষ্টেসন পর্য্যন্ত চলে গিয়েছিলে। কত সাধতে হয়েছিল মনে আছে—তোমার মত একটা...

প্রসাদের কথার মধ্যে এক তিল মিথ্যা নেই। প্রতিবাদের কোন অবকাশ নেই। নিছক নিরেট সব সত্য কথা। কাহিনী নয়—ঘটনায় গড়া ইতিহাস।

প্রসাদ তখুনি আবার শান্ত হয়ে এল। —তুমি যেজন্য এসেছিলে, সে প্রয়োজন আমার আর নেই। সে রুচি আমার আর নেই। তুমি এখানে মিছামিছি পড়ে আছ।

প্রসাদের গলার স্বর আরও নরম হয়ে এল। —সত্যিই আমি এভাবে টিঁকতে পারছি না লতা। তোমার বোঝা উচিত।

এক পীড়িত মানুষের কাতরোক্তির মত—নিঃসহায়ের আবেদনের মত শোনালো কথাগুলি।

লতা বললো।—সত্যি বলছো, আমায় যেতে হবে?

প্রসাদ।—হাঁ। শুধু ভাবছি, কার সঙ্গে যাবে।

লতা উঠে দাঁড়ালো। প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো—তার জন্য ভাবতে হবে না। আমি একাই যাব—কেউ জিজ্ঞেসা করলে বলে দিও কিছু—মামা-কাকা কেউ এসে নিয়ে গেছে। কাল ভোরেই যাচ্ছি।

লতা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মাত্র আজ রাত্রিটা। জেগে থাকলেও কেটে যাবে, ঘুমিয়ে পড়লেও কাটবে। তবু খুব ভোরেই উঠতে হবে—বিক্রম আসবার আগেই। কিন্তু প্রতিশোধ নিয়ে যেতে হবে।

লতা ভেতরের বারান্দার অন্ধকারে মেজের ওপর নিঝুম হয়ে বসেছিল।

উঠোনে তখনো থালায় সাজানো ডালের বড়িগুলি হিমে ভিজ্‌ছে—আচারের বয়ম দুটো রয়েছে। এখনো উঠিয়ে রাখা হয়নি—আর প্রয়োজন নেই।

লতা একবার নিজের মনে হেসে ফেললো। ভদ্রলোক ভয় পেয়েছে। যদি কেউ টের পেয়ে যায়, এই ভয়। আজ যদি মাসীমা, বুঝতে পারেন, তারকবাবু হরিশবাবু শুনতে পান যে, আমি লতা নই, আমি তারকেশ্বরের পক্ষীবিবি? আমিই যদি ফাঁস করে দিই? কিন্তু তা কি করে হয়? সে যে অসম্ভব! ওভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। বহুজনের স্মরণে ও সমাদরে তার এই ছদ্মনামের শঙ্খ বাজতে থাকুক চিরকাল।

আহা! বুড়ো মানুষ রাখালবাবু—মেসোমশাই। ঠাকুর দেবতার মত শুদ্ধ। মাথা ছুঁয়ে কতবার আশীর্ব্বাদ করেছেন! সব পাপ আমার লাগুক্। মেসোমশাই চিরদিন এমনি সুখী থাকুন, মাসীমার বেরিবেরি সেরে যাক্।

এক বছর দু-বছর পরে, এ বাড়ীর ভবিষ্যতে এই রকম একটি রাত্রি লুকানো আছে। তখন হয়তো লোকে শুধু জানবে—লতা মরে গেছে। বিধবা আভার মাথায় নতুন করে সিঁদুরের দাগ পড়বে—এই বাড়ীর ঘরে ঘরে ওর সংসারপণার চুড়ি-শাঁখা বাজবে ঠুং ঠুং মিষ্টি শব্দ করে।

উনি কি করছেন? লতার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। দাঁতে দাঁত ঘসে গেল। ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। বোধ হয় বই পড়ছেন। মতিগতি ফিরে গেছে? একবার যাচিয়ে দেখলে হয়। রেশমী পায়জামাটা পরে, বেণী দুলিয়ে, চোখে সুর্ম্মা লেপে, এক পাত্র হুইস্কি নিয়ে যদি কোলের ওপর গিয়ে চড়ে বসি, চরিত্রবানের মুরোদটা দেখি একবার।

কিন্তু তা করতে পারলেও যে ভাল ছিল। এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। লোকটাকে কুষ্ঠরোগীর মত অস্পৃশ্য মনে হচ্ছে আজ। জীবনে কোন লুচ্চাকে ছোঁবার আগে এত ঘৃণা হয়নি কখনো। কড়া করে এক পেয়ালা মদ গিলে নিলে বোধ হয় এ ঘেন্না ভেঙে যাবে। কিন্তু মদ?

মনে হতেই বুকটা দুরদুর করে উঠলো লতার।

তার সব সামর্থ্য যেন খসে পড়ে গেছে যেন সব দিক দিয়ে অসহায় হয়ে গেছে। চোখ দুটো আঁচল দিয়ে মুছে নিল লতা। যাত্রাগানের পালায় রাণীগুলো বনবাসে যাবার আগে বোধ হয় এই রকম কাঁদে।

নিস্তব্ধ রাত্রির শূন্যতার মধ্যে একটী প্রতিশোধের মুহূর্তকে শুধু মনে মনে জপছিল লতা। উচুদরের প্রেমে রঙীন ঐ ভদ্র বক্তবীরের পাপমুক্ত পৌরুষের ওপর শেষবারের মত পঙ্কীবিবির ভাষায় থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। ভদ্রয়ানার শিকলে বাঁধা জমিদার প্রসাদ রায় শুধু অপমানের যন্ত্রনায় ছটফট করবে, সহ্য করবে আর নীরবে তাকিয়ে থাকবে। এইটুকু প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে লতা।

ঘরের ভেতর হঠাৎ পড়া বন্ধ করে প্রসাদ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

আহত সাপ পালিয়ে গেলেও কোন না কোন দিন ফিরে এসে কামড়ায়। প্রসাদের মন হঠাৎ এই ধরণের একটা শঙ্কায় ভরে উঠলো। রাগানো উচিত নয়—বেশ খুসী করে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত।

একতাড়া নোট ড্রয়ার থেকে বার করে, প্রসাদ লতার কাছে আলো হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

—এই নাও। আমার ওপর মনে মনে রাগ পুষে রাখলে না তো লতা? আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি—ক্ষতি করিনি।

লতা শুধু হাত পেতে নোটগুলি নিল। প্রসাদ আবার বললো।—কি চুপ করে রইলে যে!

আলোর ধাঁধাঁনি থেকে দৃষ্টিটাকে আড়াল করার জন্যই বোধ হয় হেঁটমুখ হয়ে, মাথার ওপর কাপড়টা বড় করে টেনে দিয়ে লতা বললো —না, তুমি ক্ষতি করবে কেন, আন্তাঠাকুরঝি আমার এ সর্বনাশটা করলে।

হৃদ্‌ঘনশ্‌

শুঁয়াপোকাটা দেয়ালের গা ধরে এগিয়ে আসছে—কুৎসিৎ নির্বোধ ও ভীরু ক্ষুদ্র একটি রোমশ সর্বনাশ যেন কেৎরে কেৎরে এগিয়ে আসছে; এই পোকাটাও একদিন প্রজাপতি হয়ে যাবে। বসন্তের বাতাসে এরই বিচিত্র পাখা থেকে রঙীন ধুলো ঝরে পড়বে। একথা বিশ্বাস করতে বাধা নেই; খুব বেশী আশ্চর্য হই না। কিন্তু শ্যামুও সাধু মহারাজ হয়ে যাবে, একথা কখনো মনে আসেনি, এখনো বিশ্বাস করতে পারি না। এটা যেন এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক অনিয়ম।

সুরেনদা বললেন।—কিন্তু তাই যে হয়েছে।

কুঞ্জবাবু বললেন। শ্যামু শ্যামুই আছে, শুধু ভোল বদলেছে।

চরণ ডাক্তার বললেন।—বহুজন দুঃখায় বহুজন অহিতায় চ। এবার বেশ পাকা বন্দোবস্ত করে পরের সর্বনাশ করছে।

শুঁয়াপোকাটা টুপ করে টেবিলের ওপর পড়ে জড়িয়ে রইল। শ্যামুও

ঠিক এইভাবে এক একদিন আমাদের পায়ের কাছে অসহায়ভাবে গুটিয়ে পড়ে থাকতো।—এ যাত্রা বাঁচিয়ে দাও মিতুবাবু। ভবিষ্যতে আর কখনো হবে না।

মনে পড়ে, শ্যামুর কাজ ছিল গুলি খেয়ে নেশা করা আর জুয়ো খেলা। রোজগার ছিল ষ্টেশনে হাঁক দিয়ে বিক্রী করা—লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধুলি, এক আনা প্যাকেট। কতবার কত অপরাধের দায়ে ধরা পড়েছে শ্যামু। আমরাই ওকে রক্ষা করেছি। টাকা দিয়েছি, মোকদ্দমার খরচ যুগিয়েছি। তারপর সাবধান করে দিয়েছি।

শ্যামুর কাছে শুনেছিলাম, ওর পিতৃদেব নাকি এক অতি বিত্তশালী ও অতি নিষ্ঠুর জমিদার। এমন বাপ না মরলে শ্যামু আর ঘরে ফিরবে না। সেই কটা দিন সে আমাদেরই দয়ার আশ্রয়ে কাটিয়ে দিতে চায়। তারপর, সম্পত্তি পাবার পর প্রত্যেকটি রূপোর দেনা সে সোনার ওজনে শোধ করে দেবে।

শ্যামু উধাও হয়েছিল প্রায় দশটি বছর। আজ আবার নতুন করে ওর নাম শুনছি—লোকের মুখে মুখে। লোকটি সেই বটে, সে নাম আর নেই। শ্যামু এখন বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম। আশ্রম করেছে; অন্ততঃ শত পাঁচেক দীক্ষিত শিষ্য ও শিষ্যা আছে। ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা আরও পাঁচ শত।

প্রতি সন্ধ্যায় শ্যামুর আধ্যাত্মিক মহিমার বহু কীর্তিকাহিনী কানে শুনতে পাই; নিত্য নতুন সব অলৌকিক ঘটনা,—বিচিত্র ও অদ্ভুত। বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যামের মহিমা অদৃশ্য এক জালের মত দূর দূর দেশের ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, জমিদার ও মার্চেণ্টদের ভক্তিবিগলিত হৃদয়গুলি যেন ছেঁকে এনে ফেলেছে তার আশ্রমের আঙিনায়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। যা শুনছি তা সবই বিশ্বাস হয় না। মনে হয় অনেক কিছু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। তবে

হ্যাঁ, শ্যামু কিছু একটা কাণ্ড করার চেষ্টা করছে নিশ্চয়। কোন বড় রকমের দাঁও মারার মতলবে আছে।

সুরেনদা, চরণ ডাক্তার ও কুঞ্জবাবু—ব্যাপার দেখে সব চেয়ে বেশী চটে গেছেন। মানুষের বিশ্বাসেরও তো একটা রীতি-নীতি আছে। যে কোন একটা উজবুগ জটা চিমটে নিয়ে ছুটো ধর্মের বুলি ছাড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবতার বানিয়ে ফেলতে হবে—এতটা মতিভ্রম শিক্ষিত লোকেরও কি করে হয়? শ্যামু যতই ঘুঘু লোক হোক, অন্তত গুরু-অবতার সাজবার মত মার্জিত ধূর্তামিও যে ওর নেই।

সবাই বললেন,—শ্যামুকে একবার শাসিয়ে দিলে হয়; এই ভড়ং ছাড়ুক, নইলে সব পুরণো কুকীর্তি সাক্ষী-প্রমাণ দিয়ে ধরিয়ে দেব। আশ্রমবাজি বেরিয়ে যাবে।

বললাম।—যদি গ্রাহ্য না করে?

চরণ ডাক্তার।—চেলাচেলীগুলিকে সব কথা বলে ঘাবড়ে দেব। তা'হলেই শ্যামুর চাক ভেঙ্গে যাবে।

গুড ফ্রাইডের ছুটীর একটি দিনে মোটরবাসে চারটী ঘণ্টা সফরের পর ট্রাঙ্ক রোডের একটা বাঁকে এসে থামলাম। বাবাজী হ্রদ্‌ঘনশ্যামের আশ্রম দেখা যায়—বাগান, পুকুর ও মন্দির। পাশে একটা শালবন—তপোবনের মত চেহারা। শীর্ণ একটা নদী আশ্রম-উদ্যানের প্রান্ত ছুঁয়ে চলে গেছে। পরেশনাথ পাহাড়ের ঘননীল ছায়ায় আকাশের ছবিটা আরও স্নিগ্ধ।

আশ্রমে ঢুকেই প্রথমে মন্দিরের দিকে চললাম। শ্যামু বড় শিবভক্ত ছিল জানতাম—হয়তো শিবমূর্তি বসিয়েছে।

মন্দিরের ভেতর উঁকি দিয়ে আমরা চারজনেই চারটি পাথরের থামের মত স্থির হয়ে গেলাম। এমন ভয়াবহ, এমন অপার্থিব, এমন প্রচণ্ড

বিস্ময়কর দৃশ্য কখনো কল্পনায়, অনুভবে ও অভিজ্ঞতায় জীবনে আমরা দেখিনি।

শ্যামু বসে ছিল। মন্দির ঘরে কোন ঠাকুর দেবতার মূর্তি বা ছবি ছিলনা, একটা শিলাবেদীর ওপর বাঘের ছাল পেতে স্বয়ং শ্যামু জীবন্ত বিগ্রহের মত সমাসীন—বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক গরদের ধুতি ও চাদর পরে, একটা ঝালর লাগানো প্রকাণ্ড পাখা নিয়ে বাবাজীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন ও ব্যজন করতে লাগলেন।

একদল মহিলা মন্দির ঘরে ঢুকলেন—আমাদের একটু সরে দাঁড়াতে হলো। আমাদের 'প্রথম হতভম্ভতা যেন একটু একটু করে কেটে যেতে লাগলো।

শ্যামুর চেহারাটা আর একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম। শুঁয়াপোকা ঠিক প্রজাপতি হয়নি—অজগর হয়েছে। বপুটী যেমন নধর, তেমনি বিরাট; অতি মূল্যবান ও মসৃণ রেশমের গৈরিক বেশ। মেদচিক্কণ অবয়বে একটা অসাধারণ সুখ-সন্তোষ ও সাফল্যের দীপ্তি। সুরেনদা হাতদুটী কপালে ঠেকিয়ে প্রায় প্রণাম করে ফেলছিলেন। একটা চাপড় দিয়ে জোড়-করা হাত দুটো ছাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সুরেনদার চোখ দেখে বুঝলাম যে, তাঁর সম্বিৎ তখনো তেমনি ভোঁ মেরে আছে।

বাবাজী তখন পর্য্যন্ত চোখ বুঁজেই ছিলেন। আর কতক্ষণ থাকবেন বুঝলাম না। ধৈর্য আর ধরে রাখি কতক্ষণ? বুঝলাম, যার সঙ্গে লড়তে হবে, সে আর শ্যামু নয়; সে সত্যই হৃদ্‌ঘনশ্যাম। আশ্রমে ঢুকবার আগে পর্যন্ত যে বে-পরোয়া সাহস মনের মধ্যে শানিয়ে রেখেছিলাম, প্রথম দেখার আঘাতেই যেন তার খানিকটা ধার কমে গেল। কিন্তু এই

তো হচনা! বাবাজী একবার চোখ খুলে আমাদের দেখুক। তারপর দেখি কোন্ দিকে ঝড়ের গতি চলে।

বাবাজী চোখ খুললেন না; শুধু হাসতে লাগলেন—অদ্ভুত রহস্যময় অথচ তীক্ষ্ণ সেই হাসি। গরদ-পরা ভদ্রলোক জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলেন।

বাবাজীর গলা থেকে শান্ত আবেগভরা কয়েকটি কথা বেজে উঠলো।

—এতদিনে তারা এল। আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

মন্দিরের সমাগত সকল পুরুষ ও মহিলা কৌতূহলভরা দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেখতে লাগলেন। একজন ভদ্রলোক এসে সবিনয়ে বললেন—ভেতরে এসে বসুন।

ভেতরে গিয়ে বসলাম। বাবাজী আবার স্থির হয়ে গেলেন। বোধ হয় নিঃশ্বাস পড়ছে না। ঠোঁট দুটো সেতারের তারের মত কাঁপছে—আর সেই সঙ্গে বহুদূরে কোন শালবনে চাকভাঙা মৌমাছির গুঞ্জরণের মত একটা শব্দ।

সমাগত নরনারী এক সঙ্গে প্রণাম করে উঠে পড়লো। প্রণবের ক্লাস শেষ হলো। প্রত্যহ সকাল বেলা একবার করে হয়।

বাবাজী যখন চোখ মেললেন, তখন ঘরে আমরা চারটি অবিশ্বাসী অভাজন ছাড়া মাত্র গরদপরা ভদ্রলোক আছেন। এঁর নাম পরম বাবু; তাঁর ইহলৌকিক যথাসর্ব্বস্ব এই আশ্রমকেই দান করে দিয়েছেন। বলতে গেলে ইনিই বাবাজীর প্রধান শিষ্য। আশ্রমের এক্সিকিউটিভ ইনিই।

বারকোশে সাজানো নানারকম মিষ্টি ও নোনতা খাবার, চা এবং সরবৎ পৌঁছে গেল।

বাবাজী বললেন—আজ তোমাদের সেবা করবার সুযোগ পাব, একথা আমি আগেই জানতাম। তাই কাল রাত্রি থেকেই তৈরী হয়ে আছি। হাঁ, তারপর আছ কেমন সুরেনবাবু ?

সুরেনবাবু আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দিলেন।—তা আপনি সেবাটেবার কথা ওসব কি বলছেন ? আপনি সেবা করবেন, না আপনাকেই……।

সুরেনদার দিকে তাকিয়ে শুধু একবার চোখের ইঙ্গিতেই ভৎর্সনা করলাম। সুরেনদা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামলে গেলেন।

পরমবাবু একবার বাইরে গেলেন। সুযোগ পেয়ে এইবার জিজ্ঞাসা করলাম।—এসব কি কাণ্ড স্বামু ?

বাবাজী হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম।—হাসলে কথার উত্তর দেওয়া হয় না। তোমাকে বলতে হবে কেন এসব করছো। আমাদের কাছে বাজে কথা বলে নিষ্কৃতি পাবে না।

বাবাজী হাসতে লাগলেন। হাসির প্রতিধ্বনিতে মন্দির ঘরের বাতাস গম্‌গম্ করতে লাগলো। শুধু হেসে চলেছেন। হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্তন। বাবাজী একেবারে স্তব্ধ। শান্ত গম্ভীর মুখ—দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। বাবাজী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার সহজ হয়ে গেলেন।

আবার বলতে যাচ্ছিলাম, কুঞ্জবাবু কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে আপত্তি করলেন। কী করবো ভাবছি, বাবাজী বলে উঠলেন।—নিতুবাবু, তোমরা এবার একটু কষ্ট কর। ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। কেষ্টকথাটা সেরে ফেলি, তারপর গল্পগুজব করা যাবে। তোমরাও এস সবাই।

বাবাজী গাত্রোত্থান করলেন।

কেষ্টকথা শোনবার অধিকারী সবাই হতে পারে না। বাবাজী যাদের

মনোনীত করেন, শুধু তারাই শোনে। আশ্রমের উত্তর দিকে একটা লতামণ্ডপের পাশে অল্প প্রশস্ত একটি ঘর। দুটী প্রৌঢ়া, একটি তরুণী এবং জনদশেক বৃদ্ধ প্রৌঢ় ও যুবক আগে থেকেই সেই ঘরে বসেছিল। আজকের দিনের মত এরা ছাড়পত্র পেয়েছে।

বাবাজী ও প্রধান শিষ্য পরম বাবুর সঙ্গে আমরা চারজনও ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরের দেয়ালে একটী বহু পুরাতন ছেঁড়াময়লা ক্যালেণ্ডার টাঙানো। ক্যালেণ্ডারের ছবিটি হলো মুরলীধারী কৃষ্ণ—স্থানে স্থানে আবীর ও চন্দনের ছিটে লেগে আরও বিচিত্র হয়ে রয়েছে।

বাবাজী ধ্যানে বসলেন। সমবেত সকলেই চোখ বুঁজে ফেললো। সুরেনদা তো প্রায় সমাধিলাভ করে ফেলেছেন বলেই মনে হলো। দেখলাম কুঞ্জবাবু মিটমিট করে একবার আমার দিকে তাকিয়ে শেষে চোখ বুঁজে ফেললেন। এই ঘরভরা এক অভিনব আধ্যাত্মিক সুষুপ্তির মধ্যে শুধু আমারই চোখ দুটো আশঙ্কায় জেগে রইল।

শুনলাম বাবাজী আস্তে আস্তে অস্পষ্ট স্বরে একটা ভজন গাইছেন। এ ভজন কোন কবির রচনা নয়। এই ধ্যানের আবেশে বাবাজী যা দেখছেন, সেই সব ঘটনা আপনা থেকেই সুর বেঁধে গানের রূপে তাঁর গলা থেকে বার হয়।

হঠাৎ বাবাজী চীৎকার করে কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠলেন।—গোঠে গোকুলে বেণু বাজে। বাবাজী আকুল হয়ে মাথা দোলাতে লাগলেন। এক একবার হাত দিয়ে কান দুটো ঢেকে রাখছেন—যেন সেই বংশীধ্বনি তাঁর মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ খাবলাচ্ছে।

আবার চুপ। বাবাজী নিষ্কম্প দীপশিখার মত সুস্থির ভাবে যেন জল-জল করতে লাগলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা এভাবে কেটে গেল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস ঘরের ভেতরে এসে হুটোপুটি করতে আরম্ভ করলো।

থর্‌থর্ করে নড়ে উঠলো দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটা।

—শুনে নে, যে আছিস শুনে নে। বাবাজী পাগল রোগীর মত ছটফট করে চেঁচাতে লাগলেন। তারপরেই দেয়ালের গায়ে একেবারে এলিয়ে পড়ে চুপ করে গেলেন। শুধু ঠোঁট দুটো কেঁপে বিড়বিড় করতে লাগলো।

সোহং! সোহং সোহং! সকলেই শুনছে, ক্যালেণ্ডারের কৃষ্ণ কথা বলছে। দেখতে পাচ্ছি, চরণ ডাক্তারের হাতের রোঁয়াগুলি শিউরে খাড়া হয়ে গেছে। একজন বৃদ্ধ মূর্চ্ছা গেলেন। বাকী সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁপতে লাগলো।

একটি মিনিট মাত্র। বাবাজীর কাশির শব্দের সঙ্কেত বুঝিয়ে দিল—সমাপ্ত।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আশ্রমের অতিথিশালার একটি ঘরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। আছি মাত্র তিনজন। সুরেনদা সরে পড়েছেন দল ছেড়ে। তিনি বাবাজীর আশে পাশে ঘুরঘুর করছেন। মরমে মরে গিয়ে বুঝলাম—হারাধনের একটি ছেলে এই যে হারালো, আর ফিরছে না। বাবাজীর একটি শিষ্য সংখ্যা বাড়লো।

এইবার সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। শেষে কি একে একে নিভিবে দেউটি? যারা ভড়কাতে এল তারাই ভিড়ে গেল। সুরেনদার বিশ্বাস-ঘাতকতায় বাবাজী যেন আমাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের ওপর তুরুপ মেরে গেলেন। পরাজয়ের অপমানটা ভাল করেই গায়ে বিঁধলো।

বললাম।—কুঞ্জবাবু। শ্যামুকে তো একলা পাওয়া যাচ্ছে না। এবার একটু উদ্যম নিয়ে লাগুন, বাগিয়ে ধরা যাক্। শুধু ওর মতলব আর এই দশ বছরের হিস্‌ট্রি জেনে নেব। তারপর এস-ডি-ও সাহেবের

কাছে একটা দরখাস্ত করে, সব ব্যাপার ফাঁস করে, আশ্রমটা ভেঙে ফেলবার···।

কুঞ্জবাবু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চরণ ডাক্তার বললেন।—একটু ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে। ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

পরমবাবু খবর নিয়ে এলেন।—বাবাজী বেড়াতে যাচ্ছেন শালবনে। আপনাদের ডাকছেন।

ভাবলাম, এই আর একটা সুযোগ। শালবনের কোন এক নিভৃতে শ্যামুকে বাগিয়ে ধরতে হবে। কিন্তু বেড়াতে বার হয়েই খানিকটা দমে গেলাম। বাবাজীর সঙ্গে আরও দশবারোজন অন্তরঙ্গ চলেছেন। সুরেনদা বাবাজীর গা ঘেঁসেই চলেছেন।

আমরা তিনজন পেছনেই ছিলাম। বাবাজী দুবার ডাক দিলেন।—ওগো নিতুবাবু, পেছিয়ে কেন? আমার সঙ্গে এস।

কুঞ্জবাবু প্রায় দৌড়েই এগিয়ে গিয়ে বাবাজীর পাশে পাশে চলতে লাগলেন। রাগ হলো, কিন্তু উপায় নেই। আছি শুধু সুযোগের অপেক্ষায়। শুধু শ্যামুকে নয়, সুরেনদাকেও ল্যাজেগোবরে নাজেহাল করে ছাড়বো। আর কুঞ্জবাবুর ব্যবহারটাও...।

চলেছি। আগে আগে বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম, ভক্ত শিষ্য ও অন্তরঙ্গের দল শনিগ্রহের বলয়ের মত ঘিরে চলেছে। পেছনে মাত্র আমরা দুটি অবিশ্বাসী ধূমকেতু যেন তাড়া করে চলেছি—কিন্তু নাগাল পাচ্ছি না।

পাথুরে সড়কটা ধরে অনেক দূর এসেছি। এইবার রেল লাইনটা পার হয়ে মাঠে নামবো, তারপরে শালবন। শ্যামু গল্প আলাপ ও হাসি-খুশীতে নিজে মাতোয়ারা হয়ে এবং প্রায় পনেরটি ভক্তহৃদয়ের ফানুস উড়িয়ে তেমনি হন্‌হন করে চলেছে।

হঠাৎ সকলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—বাবাজী থামুন, থামুন। লাইন ক্রস করবেন না।

নাইন আপ ধোঁয়া ছড়িয়ে হু-হু করে দৌড়ে আসছে। বাবাজী একটু হকচকিয়ে তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ট্রেনটা কি জানি কিসের জন্য ক্রমেই মন্থর হয়ে, একটু দূরে এসে থেমে গেল।

পরমবাবু বললেন।—এবার এগিয়ে চলুন বাবাজী। ট্রেন তো থেমে গেছে।

—হাঁ, থেমে যেতেই হবে, চলো। বাবাজী হাসলেন। অতি গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বে ভরা সেই হাসি।

বাবাজী আবার এগিয়ে চললেন। দেখলাম কুঞ্জবাবু চট করে ঝুঁকে পড়ে বাবাজীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। বললাম।—কি ব্যাপার চরণবাবু? কুঞ্জবাবু শ্যামুকে প্রণাম করলেন মনে হচ্ছে?

চরণ ডাক্তারেরও মনের ভেতর অবিশ্বাসী ইঞ্জিনটার গর্জন যেন থেমে এসেছে। বোধ হয় দম ফুরিয়ে এসেছে। তাই কোন মতে হাঁসফাঁস করে উত্তর দিলেন।—তা প্রণাম করতে দোষ কি, বোধ হয় গায়ে পা ঠেকেছে।

বললাম।—পা ঠেকলে প্রণাম করতে হবে শ্যামুকে?

চরণ ডাক্তার আর কোন উত্তর দিলেন না। এক সঙ্গে রাগ পরাজয় আর অপমান বোধে কিছুক্ষণের জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা মারমূর্তি হয়ে রইল। এদের সঙ্গটাও ঘৃণ্য মনে হতে লাগলো। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে—নইলে কীই বা এমন ভেলকি এঁরা দেখলেন যে বিস্ময়ে আকাট মেরে গেলেন। ছেলে-বেলায় স্কুলে পড়া গোল্ডস্মিথের সেই লাইনটা বারবার মনের মধ্যে চাবুক মারছিল। শেষে তাই হতে চললো। Those who came to scoff remained to pray।

মনের প্রতিবাদ চেপে রাখতে পারলাম না। আর বেড়াতে না গিয়ে, একাই আশ্রমে ফিরে এলাম। আজ রাত্রের মোটর বাসেই টাউনে ফিরে যাব।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অতিথি-শালার ঘরে আর কেউ নেই। বাইরে থেকে একটা গোলমালের রব শোনা যাচ্ছে। মনে পড়লো, আমাকে যেতে হবে। সুরেন দা ও কুঞ্জবাবু আজ বোধ হয় কেউ টাউনে ফিরছেন না। এক যদি চরণ ডাক্তার শুধু ফেরে। সে রকমও কোন লক্ষণ দেখছি না। এতক্ষণে শালবন থেকে চরে ফিরেছেন নিশ্চয়। যাবার আগে দুকথা মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে যাব। শ্যামুকে নয়—আমারই সতীর্থ শিক্ষিত বন্ধু দুটিকে।

পরমবাবু একটা আলো হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।—একি আপনি এখনো বসে রয়েছেন! ওদিকে যে......চলুন চলুন। জীবনে এ দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাবেন না। যিনি মুক্ত, যিনি ভগবান পেয়েছেন, যিনি ত্রিকালজ্ঞ—তাঁর ইচ্ছাশক্তি, আহা! সে ইচ্ছাশক্তিকে ঠেকায় কে?

চমকে উঠলাম। কিছু ভয়ানক একটা ঘটেছে। বোধ হয় আকাশ থেকে ফুলটুল পড়ছে; কিম্বা মাটি ফুঁড়ে সরবৎ!

—কী ব্যাপার পরমবাবু?

—কুকুর ভোজন।

—সে কি?

—হ্যাঁ, বাবাজীর আদেশ নির্দেশ ও ইচ্ছা। তাঁর কাছে জীব শিব একই। বাগানে পাত সাজানো হয়েছে—দস্তুর মত আসন করে। খিচুড়ি ও মাংস রান্না হয়েছে। পাতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—কুকুররা এসেছে খেতে?

—আসবে আসবে। সেই জন্যই তো বলছি উঠুন। এ দৃশ্য দেখে নিন। বাজারে গিয়ে ময়রার দোকানের কুকুরদের যথাবিহিত সৌজন্যের সঙ্গে নেমন্তন্ন করে আসা হয়েছে।

উঠলাম। চরণ ডাক্তার বোধ হয় অনেক আগেই গিয়ে জুটেছেন। এ দৃশ্য দেখবো, ধন্য হব, তারপর হয়তো আত্মহত্যাও করে ফেলবো। পরম বাবুর সঙ্গে নেমন্তন্নের আসরের দিকে চললাম। যাবার পথে দেখলাম, বাবাজী মন্দিরঘরে একা ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। তিনি এখন এভাবেই থাকবেন। কুকুরভোজন সমাধার পর নিজে অন্ন গ্রহণ করবেন। তার আগে নয়।

যেতে যেতে পরম বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম।—কুকুরদের নেমন্তন্ন করতে কে কে গিয়েছিল ?

পরমবাবু।—আমি ছিলাম, আপনার বন্ধু সুরেনবাবু ছিলেন—আরও দু'তিনজন।

—গিয়ে কি বললেন ?

—বললাম, আজ সন্ধ্যায় বাবাজীর আশ্রমে আপনারা দুটি অন্ন গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন।

—একথা বললেন ? কুকুরগুলো কিছু বুঝলো ?

পরমবাবু খুব পরিশ্রম করে বোঝাতে লাগলেন।—মা বল্লে রক্ষে ছিল। বাবাজী আমাদের আস্ত রাখতেন! কুকুর হয়েছে তো কি হয়েছে ? আপনি বিষয়ী মানুষের দৃষ্টি দিয়ে এসব বিষয় বিচার করবেন না।

নেমন্তন্নের আসরের দিকে যাচ্ছি। দেখলাম বাগানের কয়েকটা গাছে বড় বড় বাতি ঝুলিয়ে দিয়ে জায়গাটা আলোকিত করা হয়েছে। সারি সারি আসনপাতা। সামনে কলার পাতায় খিচুড়ি ও মাংস। মাংস ও খিচুড়ির সুগন্ধে বাগান থম্‌থম্ করছে।

চারিদিকে রব উঠলো।—এসেছে, এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের নানাদিক থেকে, নানা ঘর ও কক্ষ থেকে উৎসুক দর্শক ও দর্শকা ছুটে আসতে লাগলো। বুঝলাম, নিমন্ত্রিত কুকুরেরা এসে গেছে। পরমবাবু দৌড়লেন। আমি দৌড়তে আর পারলাম না। একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে দর্শকদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে গলা উঁচিয়ে রইলাম।

দেখলাম দৃশ্য। কিন্তু কোথায় কুকুর? সব আসনগুলিই খালি। শুধু একটা রোগাটে চেহারা সাদা রঙের দীনহীন কুকুর আসন থেকে একটু দূরে ভয়ার্ত ও সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে।

এক ভদ্রলোক ভাবে গদগদ হয়ে বললেন।—ঐ যে এসেছে। আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

আবার শুনলাম ফিসফিস করে কে একজন বলছে।—কই পরম'দা, কালো গুলোকে এত করে বলা হলো, একটাও এল না কেন?

ভাবুক ভদ্রলোক আবার যেন ভাবের ঘোরে ঢেঁকুর তুললেন ঘড়ঘড় করে।—আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

রাত্রি নটা বেজে গেছে। আর আধ ঘণ্টা পরে মোটর বাস আসবে। ট্রাঙ্ক রোডের ওপর গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

বিদায় দেবার সময় সুরেনদা কুঞ্জবাবু ও চরণ ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কোন কথা তাঁরা বলতে পারলেন না। চরণ ডাক্তারের হাবভাব দেখে বুঝে ফেললাম, তিনিও ভাল করেই টোপ গিলেছেন—বাবাজীর অলৌকিক মহিমা বঁড়শির মত মনের নাড়ীতে গিয়ে বিঁধেছে। শুধু পরমবাবু অনুরোধ করলেন বারবার।—আজ রাত্রিটা আপনিও থেকে গেলে পারতেন।

—না। বেশ দৃঢ়ভাবেই বললাম।

তবু শুধু পরমবাবুই বিদায় দিতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। সড়কে পা বাড়িয়ে দিলাম। পরমবাবুকে নিছক ভদ্রতার খাতিরে একটা নমস্কারও জানালাম না। ইচ্ছে করেই করলাম না।

পরমবাবু কিন্তু হাত তুলে নমস্কার করলেন।—আচ্ছা, আসছে পূর্ণিমায় অবশ্য আসবেন নিতুবাবু। বাবাজীর ইচ্ছেয় আর একটা উৎসব আছে। বাঘ ভোজন হবে।

গ্রাম-যমুনা

কত রকমের পরব ও উৎসব আছে; কিন্তু হোলির মত কোনটি নয়। চম্পুর্গাঁয়ের চামারেরা একথা ভাল করে জানে।

ক'মাস আগেই গেছে নাগপঞ্চমী; সকাল থেকে মেয়েরা ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করেছে। দেয়ালগুলি নতুন করে গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে, চূণ গুলে বড় বড় সাপের মূর্ত্তি এঁকেছে তার ওপর। প্রায় সারা গাঁয়ের নরনারী শিশু পাতকুয়োগুলির কাছে ভীড় করে স্নান করেছে, মাটির তেলাইয়ে সিঁদূরের ফোঁটা লাগিয়ে ও দুধে পূর্ণ করে ঘরের বাইরে রেখে দিয়েছে। সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করেছে শ্রীনাগের সেই নৈবেদ্যের সামনে। বাস্তু সাপের গর্ত্তে ভাত ঢেলে দিয়েছে তারা। সারাদিন মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে গান গেয়ে শ্রীনাগের কৃপা প্রার্থনা করেছে। খয়ের গাছের ডাল দিয়ে ঘরের চারদিক গণ্ডী দেগে দিয়েছে, ভবিষ্যতে কোন সাপ সেই গণ্ডী লঙ্ঘন করে তাদের সুখের নীড়ে বিষ ছড়াতে আসবে না।

তারপর সন্ধ্যাও হলো, চম্পুর্গাঁয়ে ভরাবর্ষার মেঘের ঘটা অন্ধকার ঘনিয়ে আনলো। বর্ষণে প্লাবনে ছোট্ট চম্পুর্গা যেন গলে যাচ্ছে। অদূরে যমুনার বুকে ঢল নেমেছে—জলের তোড়ের গোঙানি শোনা যায়। তবু সেবক মাহাতোর ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে ওঠে—ঢোলের শব্দ জেগে ওঠে। পানভোজন আর হাসিখুসীর কলরব, নাগপঞ্চমীর উৎসবের কোন ব্যতিক্রম হয় না। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ কাজরি গায়। মেয়েরা দলবেঁধে গান করে।

উৎসবে গাঁয়ের প্রায় সকলেই উপস্থিত। শুধু আজানি সাধু চা
তাকে কেউ আসতেও আহ্বান অনুরোধ করেনি।

সাধুকে এইভাবে গাঁয়ের সবাই মিলে শাস্তি দিয়ে আসছে, আজ
বছর ধরে। দোষ সাধুরই বলতে হবে।

সেবক মাহাতোর মেয়ে রূপা। সকাল বেলা বিলে হাঁস ছাড়তে
আর স্নান করে ফিরে আসে। সাধু চামার বিলের ধারে ঘুরঘুর করে
করে তাকিয়ে থাকে। তারপর একদিন কথাটা বলেই ফেললো সাধু
রূপা আমার কথাটা কিছু ভাবছিস্ না?

এর পর আর তাকে মাপ করা যায় না। বয়সে রূপার চেয়ে ছে
হয়েও এত সাহস পায় কোথা থেকে? সাধুকে একরকম একঘরে কে
রাখা হয়েছে।

সেবক মাহাতো সাধুকে অনেকবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—
আমার মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী নয়। তুমি এসব নিয়ে আ
আলোচনা করো না। বারবার জিদ করতে এস না।

রূপা দেখতে না হয় খুবই ভাল, কিন্তু সাধুর সঙ্গে বিয়ে দিতে
দোষটা কি?

দোষ রূপার ইচ্ছেটা। আগে রূপা একরকম রাজীই ছিল। জিজ্ঞেস
করলে লজ্জা পেয়ে হাসতো, হাঁ-না কিছুই বলতে পারতো না। কিন্তু রূপা
ষ্টেশনের হাসপাতালে কাজ পেয়েছে—মেয়েদের ওয়ার্ডের জমাদারণী।
এই চাকরী জোটার সঙ্গে সঙ্গে রূপার সাজসজ্জা আর মনটা বোধ হয়
চম্পুগাঁয়ের মেটে বাড়িগুলির সঙ্গে আর খাপ খাচ্ছে না। গ্রামের মেয়ে
হয়েও, গ্রাম-যমুনার ডাক যেন ভুলতে বসেছে রূপা।

গাঁয়ের অনেকে রূপার ওপর ও সেই সঙ্গে সেবক মাহাতোর ওপর খুব
বেশী প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু মাহাতোর টাকার জোর আছে—পুজো-পার্বণে

সেবকের উদারতাই গাঁয়ের আনন্দোৎসবের একমাত্র আশ্রয়। আর সাধু যদিও কারিগর মাত্র, কিন্তু খেটে খায়—বয়স আছে শরীরও আছে। ও যদি রাজী হয়, তবে চম্পূগাঁয়ের যে কোন মেয়ের বাপ খুশী হয়ে ওকে জামাই করতে রাজী আছে। কিন্তু সাধুর রোথ ওই একদিকে—রূপা।

মেয়েরা মনে মনে জ্বলে। গাঁয়ের বাতাসে রূপার নামে দু'একটা বদনামের কথাও মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করে ওঠে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সেবক মাহাতোর প্রতিপত্তি কেউ ভুলতে পারে না।

গাঁয়ের অনেকে তাই সাধুর ওপরে চটা। ঠিক হয়েছে, এইভাবে শুধু হা-হুতাশ করে আর সেবক মহাতোর কাছে অপমান খেয়ে ওর দিন কেটে যাক্।

রূপা নিজেকে গাঁয়ের অন্য মেয়েদের চেয়ে ভিন্ন রকম ভাবে এবং ভিন্ন করে রাখে। সকলের সঙ্গে এক হয়ে সরলভাবে মিশতে পারে না। মেয়েরা আজও একবার রূপাকে গাইতে ডাকলো; রূপা বললো—না, ওসব আমার ভাল লাগে না।

সভা ভাঙলে সবাই চলে যায়। তখন অন্ধকারে কাদাজলের ওপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ করে একটি মানুষ সেবক মাহাতোর ঘরে এসে ওঠে। সাধুকে দেখে মাহাতোর নেশাড়ে মেজাজ জ্বলে ওঠে।—এবার তুমি মার খাবে আমার হাতে।

সাধু তবু মিনতি করে বলে যায়; মাহাতো নিজের গর্জনে কিছু শুনতে পায় না। রূপা ঘরের ভেতর থেকে সব শোনে।

দশহরা উৎসব। শরতের নতুন আলোর সঙ্গে ক্ষেতের মাটিতে আর তৃণে শস্যে নতুন প্রাণের রঙ লাগে। গাঁয়ের সকলে শোভাযাত্রা করে

বার হয়। মেয়েরা যে-যার ভাল সাজটি পরে নেয়। আগে আগে পুরুষেরা ঢোল বাজিয়ে চলে, পেছনে মেয়েরা একটানা অবিরাম গেয়ে চলে। সবচেয়ে আগে থাকে প্রকাণ্ড রঙীন পাগড়ী মাথায় ও লাঠি হাতে সেবক মাহাতো, রূপাও থাকে শোভাযাত্রার সঙ্গে। ঠিক সঙ্গে নয়, সকলের পেছনে একটু সরে, একা একা। এক বাঙালী জমিদারবাবুর বাড়ি প্রতিমা দেখে, মেলা ঘুরে ওরা আবার ফিরে আসে গাঁয়ে। সেবক মাহাতোর ঘরে পান-ভোজন চলে।

সাধুকে কেউ ডাকে না। এক একটি পরব আসে, গাঁয়ের হৃদয়টার যেন কপাট খুলে যায়। সবাই সবাইকে ডাকে। সমস্ত দিনটা যেন লোকের মন থেকে রাগ হিংসার ধুলো ঝরে পড়ে যায়। সবাই সৌহার্দ্যের আনন্দে চঞ্চল। লোকের অহঙ্কারের বেড়াগুলি এই সময় একটু আল্‌গা থাকে। সাধু ঠিক এই পরবের দিনগুলিতেই সাহস করে তার আবেদন নিয়ে আসে সেবক মাহাতোর কাছে। শুধু সেবক নয়, গাঁয়ের আরও দু-চারজন বয়স্কদের কাছে সে তার বেদনা ও বক্তব্য বুঝিয়ে বলে। কিন্তু কোন ফল হয় না। সবাই বলে—এরকম দেওয়ানা হয়ে গেলে কেন ছোকরা? যেখানে আমল পাবে না, সেইখানে ভিড়বার এত জিদ্ কেন?

দশহরার রাতে সেবক মাহাতোর ঘরে সাধু আবার এল। সেবক অন্য-দিনের মত আর তেমন বকাবকি করলো না। কিন্তু প্রত্যাখ্যানটা তেমনি সরল ও স্পষ্ট করে জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিল।—দেখ সাধু, তুমি লোক ভাল জানি; কিন্তু পয়সাও তো একটা ইজ্জৎ। তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে সেইজন্য হতে পারে না। হাঁ, যদি তোমার কিছু ক্ষেতজোত থাকতো, তবে না হয়……।

সাধু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে চলে গেল। রূপা ঘরের কপাট একটু ফাঁক করে দেখছিল ও দুজনের কথাগুলি সবই শুনছিল।

দেয়ালির উৎসবও এসে গেল। আবার ঘরদোর নিকিয়ে তকতকে করা হয়েছে। এ মাসেই রূপার পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে। আজ সে নিজে হাতে প্রদীপ সাজালো ঘরের চারদিকে। সন্ধ্যে হতেই উঠোনে একটা আগুনের কুণ্ড করে রাখলো—ভাঁড়ে করে জল রেখে দিল পাশে। মাঝরাত্রে প্রেতাত্মারা আসবে নিজের নিজের পুরানো ঘরে। জল খেয়ে তৃপ্ত হবে।

রাত্রিহতেই সেবক মাহাতোর ঘরের দাওয়ায় জুয়া আর মদের হুল্লোড় মেতে উঠলো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চললো উৎসব। সকলে চলে যাবার পর সেবক নিজেও ঘরের ভেতর চললো। উঠোনের দিকে তাকিয়েই ভয়ে চমকে উঠলো।—কে ?

যে-মূর্তিটা এগিয়ে এল সে আর কেউ নয়, স্বয়ং সাধু। সেবক যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চীৎকার করে উঠলো।—টাঙিটা দেতো রূপা; আজ ওর সব সখ ঘুচিয়ে দেব।

রূপা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল; কিন্তু টাঙি হাতে নিয়ে নয়। একটা মোড়া নিয়ে এসে মাহাতোর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো।—নাও, বসে কথা বলো।

মাহাতো বসে নিয়ে শান্ত হলো। সাধুর সেই পুরানো কথা—একটানা বলে চলেছে। মাহাতো শুনে শুনে ঝিমিয়ে পড়ছে। রূপা আজ আর ঘরের ভেতরে যায়নি—একটু দূরে দাঁড়িয়েই সব শুনে গেল।

মাহাতো হঠাৎ সচকিত হয়ে বললো।—আরে যা বাবা, বিরক্ত করিস্ না। তোর বয়স তো রূপার চেয়ে অনেক কম। আর একটু বড় হলে না হয়……। যা বিরক্ত করিস না।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রূপা বাইরে বার হতেই মাটির দিকে

তাকিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে কুটীল একটা হাসি তার দু-ঠোঁটের ওপর দিয়ে যেন পাক দিয়ে গড়িয়ে গেল। রূপা দেখলো, ঘরের দোর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত কে যেন কতগুলি কালো সরষে ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। রূপা আবার হাসলো। শেষে তুক করা সরষে সহায় হলো হতভাগার। কেঁদে হলো না, কাকুতি-মিনতিতে হলো না, জিদ-আব্দার-অনুরোধ সব ভেসে গেল, তখন আর উপায় কি? মন্ত্র ফু'কে সরষে ছিটিয়েছে। আচ্ছা?

রূপা ডাক দিল।—ও মাসী, এসে দেখে যাও।

থুড়থুড়ে এক বুড়ী একটা ঘরের ঝাঁপ খুলে বাইরে এল। রূপা দেখিয়ে দিল ব্যাপারটা—তুক্-করা সরষে কে ছিটিয়ে গেছে।

বুড়ী চীৎকার করে সেই সকালেই গাঁ মাৎ করে তুললো।—সর্বনাশ করলে; কোন্ দুষ্‌মনশ পেছনে লেগেছে। এত ভাল বেটী আমার, এমন জোয়ান আর সুন্দর; তাই পেছনে লেগেছে গো। কি উপায় হবে গো।

পাড়ার অনেকে জুটে গেল। সেবক মাহাতো গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সবাই আলোচনা করলো—এমন দুষ্কর্ম্ম কে করতে পারে? ব্যাপার খুবই গুরুতর মনে হচ্ছে। এর ভেতর অনেক রহস্য আছে।

সকলে দুশ্চিন্তায় মাথা দুলিয়ে এই সব কথা বলছিল। রূপা হঠাৎ বলে উঠলো।—এত ভাবনায় কোন কাজ নাই। আমি সরষে মাড়িয়ে যাব; দেখি, কোন্ পিশাচ আমার কি করতে পারে।

রূপা হনহন করে হেঁটে চলে গেল। সকলে, সেবক মাহাতোর দিকে তাকিয়ে বললো।—কাজটা ভাল হলো না মাহাতো।

সাধু দিন গুণছিল। রূপা সরষে মাড়িয়ে গেছে বেপরোয়া হয়ে—এ খবর শুনেছে সাধু। তার বিষণ্ণ মনের আকাশে এক আহ্লাদের ঝড় নেচে

চলে যায়। রাগ করে হোক্ আর লোভ করে হোক্, হরিণ একবার ফাঁদে পা দিলেই হলো। রূপা যেন এই প্রথম তার ভালবাসার রাঙামাটীর পথ ধরে একবার হে'টে গেছে উপেক্ষা-ভরে। কিন্তু তার পর ?

সাধু শুধু দিন গুণে যায়। অনেকদিন ফুরিয়ে গেল, কিন্তু রূপার পায়ে সেই রাঙামাটীর কোন দাগ লাগে না। এদিকে সেবক মাহাতো এক নামকরা ওঝা আনিয়ে ফেলেছে। নানারকম ভয়ঙ্কর তুক্‌তাক চলেছে সেবকের বাড়িতে। শোনা গেল, সেবক মহাতোর শত্রুকে বাণ-মারার আয়োজন হচ্ছে। সাধু ভয়ে মুসড়ে পড়লো।

কিন্তু গাঁয়ের নানা জনে, নানা গোপন খবর এনে সেবক মাহাতো আর ওঝাকে বিভ্রান্ত করে তুললো। তারা প্রায়ই দেখছে—সাধু রাত্রে ঘরে থাকে না। একদিন রাত্রে দেখা গেছে—জঙ্গলে বসে মড়ার খুলিতে পেঁচার চোখ পুড়িয়ে কাজল তৈরী করছে। অমাবস্যার রাত্রে একটা হাঁড়ি নিয়ে সাধু ফল্গুর মশান ঘাটে উলঙ্গ হয়ে জল তুলে নিয়ে এসেছে।

ওঝা একদিন সরে পড়লো।—লড়াইটা একটু কঠিন হয়ে উঠেছে মাহাতো। অনেকগলি দেও-দানার সঙ্গে লড়তে হবে। আমি একা পারছি না ; আমার বড় সাকরেদকে নিয়ে আসি।

সেবক মাহাতোর সব আশঙ্কা দূর করে দিল আর একটা খবর—সাধু গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে ; পল্টনে চাকরী পেয়েছে।

হাঁ এখন না গিয়ে তার উপায় কি? কত রকম উপদ্রবই না করলো। কিছুতেই কোন কারসাজি আর সফল হলো না। ভালই হলো ; এবার সেরঘাটের বনেদী কোন রবিদাসের বাড়ির ছেলের সঙ্গে রূপার বিয়ে দিতে হবে, নিশ্চিন্ত হয়ে।

* * * *

হোলি এসে গেল। এ এক অদ্ভুত পরব। শুক্লা বাসন্তীর এক

সন্ধ্যায় বনান্তের কোলে পূর্ণচাঁদের রূপে দেখা দেবে শিশু নব বৎসর। পঞ্জিকা হাতড়ে একে খুঁজতে হয় না। আকাশের নক্ষত্র রাশিচক্র ক্রান্তি ও অয়নাংশ অঙ্ক কষে গুণে এই উৎসবের দিনক্ষণ মাপতে হয় না। অন্তরে ও বাহিরে এক অদৃশ্য পুষ্পধন্বার খেলা চলতে থাকে। আকাশের রঙে, বাতাসের স্পর্শে, আলোকের আভায়, গাছের কিসলয়ে মুকুলে হঠাৎ এক বিহ্বল যৌবন জেগে ওঠে। হোলি যেন মানুষের মন থেকে আগল খুলে বেরিয়ে আসে। এই একটি দিন মানুষ একটি সহজ সত্যকে উপলব্ধি করে, সে সত্য হলো এই যে, মানুষের অন্য পরিচয় যাই থাক, আসলে সে প্রাণ মাত্র। এই প্রাণ যখন সারা বছর ধরে সংগ্রাম করে যায়, তখন সে জীবন-সৈনিক বা সামাজিক মানুষ মাত্র। তারপর একটি দিনের জন্য বসন্তের একটি পূর্ণিমায় সে ছুটি পায়। সৈনিকের পোষাক ছেড়ে ফেলে আবার রঙীন উত্তরীয় তুলে নেয়। এই কুঙ্কুমের বর্ষা, আবীরের ঝড়, রংঝারি আর পিচকারি ফোয়ারা—নিখিল চিত্তের স্নায়ুজাল থেকে শেষ ভীরুতার চিহ্নটুকুও মুছে ফেলে রঙীন করে তোলে। হৃদয় আসি যেথা করিছে কোলাকুলি—দোল-পূর্ণিমায় মানুষের মেলায় তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।

চম্পুগাঁয়ের সেবক মাহাতোর আঙিনায় ঢোলক ও বাঁশীর শব্দে হোলির রাত্রি প্রমত্ত হয়ে উঠলো। সারা বছরে তৃষ্ণা মিটিয়ে পুরুষেরা সকলেই যেন তাড়িতে মদেতে দেহমন চুবিয়ে নিয়েছে। মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই এই দশা।

মেয়েরা আসর থেকে একটু দূরে বসেছিল। পুরুষেরা ছেলে বুড়ো সবাই নেচে গেয়ে ছড়া কাটছে। খিস্তির উদ্দাম হল্লোড় থেকে থেকে ঢেউ-ভাঙা জলরোলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। নরনারী সবারই গায়ের বসন রঙের ছোপে বিচিত্র। রূপা শুধু এড়িয়ে গেছে—মেয়েরা অনেক

অনুযোগ সাধ্যসাধনা করেছে। কিন্তু আবীরের একটি ছোট টিপ ছাড়া আর কোন রঙ সে নেয় নি। এই উৎসবে সে যেন একজন দর্শকের মত শুধু বসে আছে।

টলতে টলতে একজন এসে আসরে ঢুকলো—সাধু চামার—হাতে একটা বাঁশী। সঙ্গে সঙ্গে সেবক মাহাতো সাধুর তিন পুরুষ তুলে একটা খেউড় গেয়ে উঠলো। সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে সমর্থন জানালো—সা-রা রা-রা সা-রা রারা। ঢোলক বাজিয়ে সেবক মাহাতো গাইলো।

রাত অনেক বাত অনেক, নাই পাহারা।

ভুখ লাগা? এস এস কুত্তা হামারা॥

সকলে খুসীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঢোলকে চাঁটি দিয়ে নেচে লাফিয়ে সমস্বরে সায় দিল।—সারা রারা। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি করতে লাগলো।

সাধু চামার বাঁশীতে একবার ফুঁ দিয়ে একটা হাত তুলে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। এবার তার পালা। সাধু জবাব দিল,—

চুপ রহ, চুপ রহ, বোকা চম্পূগাঁও।

বেতাল দেবের বড় চেলা পুজো মেরা পাও।

সকলে এক সঙ্গে গর্জন করে জবাব দিল—আরে, যাও যাও!

আজ কি আর কেউ একথায় ভয় পায়। ভূত প্রেত বেতাল বরমদেব—আজ সব তুচ্ছ। সাধু চামার ভয় দেখাতে এসেছে—সে বেতালসিদ্ধ হয়েছে। এসব ফাঁকি ফন্দী ভূতচতুর্দশীর রাত্রেই মানায়।

সাধু চামার বাঁশী বাজিয়ে এক পাক নেচে নিয়ে আবার গাইলো—

খুস্ থাক দুস্‌মন, অনেক দিলে সাজা।

সেপাই হয়ে ফিরে এসে দেখ লেগা মজা॥

সকলে।—আরে যাঃ যাঃ।

সকলে যেন ধিক্কার দিয়ে উঠলো, পল্টনে নাকি চাকরী পেয়েছে

সাধু। যাক্ না চলে! আজকের দিনে আবার শাসাতে এসেছে সকলকে —মজা দেখে নেবে। আজ কে কার পরোয়া করে?

সাধু আর একবার নেচে নিয়ে ধরলো,—

তোপ ফাটা, বোম মারা, দম নাহি পায়।
লড়ে ফিরে সাধুরামের প্রাণ চলে যায়॥

সকলে।—আরে, হায় হায়!

ঢোলকের বাজনা একটু মৃদুতর হয়। মেয়েদের মধ্যেও চাঞ্চল্য কলরব একটু স্থির হয়ে আসে।

সাধু গেয়ে যায়।—

শুক বলে সুখ নাই, নাই ঠিকানা।
তবু সারীর কালো চোখে জল ভরে না॥

সকলে উত্তর দিল।—আরে, না না!

আরে না, না। এক ললিত আশ্বাসের সুর। আরে না না অভিমান করো না, চলে যেও না। জোৎস্নালোকে তোমার সারীর কালোচোখ চক্‌চক্‌ করছে, দেখতে পাচ্ছ না? সেবক মাহাতো আস্তে আস্তে একটা খঞ্জনী বাজাচ্ছে। সকলে ঢোলক বাজিয়ে দুলে দুলে নাচছে।— আরে না না। ক্লান্ত সাধু বিভোর হয়ে বাঁশী বাজিয়ে চললো। হঠাৎ বুড়ো সেবক মাহাতো যেন একটা খুসীর দমকা লেগে চেঁচিয়ে উঠলো।— সারা, রারা, হোলি হ্যায়।

মেয়েদের মধ্যে এই আনন্দ চাঞ্চল্যের ঝাপটা গিয়ে লাগলো। সব মেয়েরা মিলে হাসতে হাসতে মুঠো মুঠো আবীর নিয়ে রূপাকে চেপে ধরলো।—এইবার তোকে রঙ মাখতেই হবে।

কাগজের নৌকা

কাগজের নৌকার কথা লিখি—তত্ত্বকথা নয়। দুরন্ত নির্বোধ রঙীন মলিন, ছোট ছোট কাগজের নৌকা—ছোট ছোট স্মৃতির টুকরা। স্মৃতি ও কল্পনা দিয়া গড়া অনুভবের মানুষ আমরা। আমরা কাগজের নৌকা মাত্র, নিজেরাই তাকে গড়ি আর স্রোতের জলে ভাসাই। তারপর হঠাৎ কোন দিন কোন স্রোতের বাঁকে কাশের বনের ভীড়ে সে নৌকা লুকিয়ে পড়ে।

একটি নিয়ে নয়—আমরা কাগজের নৌকার মিছিল। এই শান্ত মুহূর্তে ভাবনার কপাট খুলে দিয়ে একবার পেছু পানে তাকাই। শুধু দেখি এক সুপ্রসারিত স্মরণের আকাশপটে জীবনের অজস্র খণ্ড খণ্ড সমাপ্ত ছবি—কাগজের নৌকারা যেন বানচাল হয়ে আছে। সুমুখ পানে তাকাই—কাগজের নৌকারা নানা আকাঙ্ক্ষায় অস্থির ও অস্পষ্ট, অপূর্ণ ও অতৃপ্ত ; কল্পনার আকাশগঙ্গায় পাড়ি দিয়ে চলেছে।

আমরা কাগজের নৌকা ভাসাই—এর মধ্যে একটা দুরন্ত আকুলতা যেন মুক্তি পায়। আমাদের অনুরাগের দল যেন যত সব অনির্দেশ্যকে ধরবার জন্য 'দূরে অজানার সুরে' ছুটে যায়। যত দিন মনের পৃথিবী তরুণ থাকে, তত দিন কৌতূহল-চঞ্চল মানুষ শিশুর মতই এক পরম অন্বেষণের পুলকে তার চিন্তাকে কাগজের নৌকার মত ভাসিয়ে বেড়ায়। কোন ঘাটের আশ্রয় পেল কি না, সেজন্য কোন আক্ষেপ নেই। এরা শুধু অস্থির—তাই এরা সবই সত্য। কাগজের নৌকা হলো জীবন-প্রভাতের খেলা।

তারপর আসে প্রবীণ দিন। বৈকালী আকাশের আলো ম্লান হয়ে আসে। দিনান্তের ক্লান্ত স্বপ্নে বহু না-পাওয়া আর হারিয়ে-যাওয়ার ব্যথা কৃষ্ণ নিশীথের আচ্ছন্নতা ডেকে আনে। তখন আর কাগজের নৌকা নয়, নদীর জলে শুধু প্রদীপ ভাসিয়ে দিই। অপর পারে চির-হেঁয়ালীর দেশে শিথিল জীবনের একটি ক্ষীণ দীপশিখার আশ্বাস পাঠিয়ে দিই।

সে আজ বহু দিনের কথা। এমনি এক বৈশাখী দুপুরে কুমার বাবুদের বাগানে ক্লান্ত হয়ে এক গাছের ছায়ায় বসে আছি। চুনারের ভাঙা দুর্গ আর পাহাড়ের গা রোদে পুড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী সেই পাহাড়ী প্রদাহের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উড়ে আসছে বাগানের দিকে।

বাগানের আমগাছগুলি জমা নিয়েছিলাম। নগদ দুশো টাকা সেলামী দিয়েছি, আর বিক্রী থেকে টাকায় দুআনা হারে রেণ্ট দিতে হবে। কলমি আমের গাছগুলি গুনতি শেষ করে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম।

এই ফুলবাড়িটা কুমার বাবুদের। বাড়িটা সেকেলে। একটা দরদালান আর বাগানের ত্রিসীমানা প্রায় শ্মশানের নদীটার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। পুবের দিকটা কদমের বন, একেবারে ছায়ায় ঠাসা। এই বৈশাখী দুপুরেও সেদিকে তাকালে মনে হয় গত আষাঢ়ের একদল পলাতক মেঘ যেন বন্দী

হয়ে আছে। ঐ বাগানটা যেন উদ্ভিদ জাতির একটা উপনিবেশ। সজীর ক্ষেত, কুমড়োর মাচান, কলার ঝাড় আর আম, কাঁঠাল ও পেয়ারার সারি। কোথাও একটু জঙ্গলের মত বাঁশের ঝোপ, ময়না কাঁটা আর কুলগাছের রুক্ষ সমারোহ। তার পরেই কিছুদূর পর্যন্ত একটা ঢালু সোঁতা জমি—কচুগাছের বড় বড় মোলায়েম পাতার সবুজ ফিকে হয়ে এসেছে। উত্তর দিকে অনেক দূর পর্যন্ত সার বাঁধা ছোট ছোট বাসকের গাছ নিঝুম হয়ে আছে—তাদের মাথার ওপর লাফালাফি করছে শত শত হলদে ফড়িং আর প্রজাপতি।

গ্রীষ্মের দুপুরে এই রকমের একটা প্রকাণ্ড বাগানের স্তব্ধতার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক মোহ আছে। এখানে বাতাসে যেন একটা অন্য পৃথিবীর গন্ধ। একটা যুগাতীত বিস্ময় মন্থর হয়ে আছে চারিদিকে। গাছগুলিকে মনে হয়—তারা বুঝি এক ভাষাহীন বনেদী জীবপরিবার।

কিন্তু সব চেয়ে অদ্ভুত লাগলো—দেখলাম খানিকটা দূরে ছোট একটি ছেলে একা একা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক এক সময় আলের ঘাসের আড়ালে ছেলেটির ছোট শরীর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হলো। এক এক জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায় আর নিবিষ্টভাবে মাটীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটাকে দেখে তেমনি আশ্চর্য ও অদ্ভুত লাগছিল; এত ছোট্ট একটি মানুষ আর এই বিরাট অটবীভূষিত উদ্যান—দূরে অতীতের একটি ক্ষীণ পথিক-প্রাণ যেন তার আশ্রয় খুঁজে ফিরছে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে রহস্যের আবির্ভাবের মত এই ছেলেটির গতিবিধি দেখছিলাম। ছেলেটি একবার গোলাপ বাগানের ভেতর ঢুকলো; তারপর বেরিয়ে এসে বাতাবী নেবুর তলায় গিয়ে একবার দাঁড়ালো। ছোট ছেলে কখনো মিছামিছি এভাবে ঘোরে না; কিন্তু কী

যে ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। ছেলেটাই বা কে? হাতে গুলতি নেই—তা না হলে বোঝা যেত চড়াই পাখী খুঁজছে। ফড়িংয়ের ঝাঁক উড়ছে—সেদিকেও ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ছেলেটা যেন এক প্রশান্ত অভিযাত্রীর মত কোন পরম অন্বেষণের প্রেরণায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সামনে এসে দাঁড়ালো ছেলেটি। পাঁচ বছরও বয়স হবে না বোধ হয়। দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা বড় তিল, তাই মুখখানা অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখাচ্ছিল। দুটী সরু সরু ঘন কালো পাখা ছড়িয়ে একটা প্রজাপতি যেন ওর কপালে যেন ঘুমিয়ে আছে।

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল; কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করে তাকে আটক করলাম।

ওর নাম নাগেশ্বর—কুমারবাবুর। ও খুঁজে বেড়াচ্ছে যাকে তার নাম তিতি—কুমারবাবুদের চাকরের মেয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম—তিতি কোথায়?

নাগেশ্বর আঙুল তুলে বাগানের চারদিকেই একবার দেখিয়ে দিল। ও বলতে চায়—এই দিকে কোথাও আছে।

বললাম—চল, আমিও তোমার সঙ্গে তিতিকে খুঁজবো।

নাগেশ্বর খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চললো।

মনে মনে তিতির চেহারাটা একবার কল্পনা করে নিলাম। চাকরের মেয়ে তিতি—নাগেশ্বরের সমানই হবে—খেলার সাথী বোধ হয়।

—তিতি আর তুমি খেলা করতে বুঝি?

প্রশ্নের উত্তরে নাগেশ্বর বললে—হাঁ।

তা হলে তিতিও খুব ছোট, গায়ে হয়ত একটা ছেঁড়া পিরাণ আর পায়ে একজোড়া মল। বোধ হয় দুরন্ত মেয়ে। নইলে এই দুপুরে বাগানে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে একা একা। ছেলেটাকে বৃথা কষ্ট দিচ্ছে তিতি।

ছেলেটা নেহাৎ থাকতে না পেরেই রোদে পুড়ে পুড়ে খেলার সঙ্গিনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একবার সন্দেহ হলো—এটা বোধ হয় কলহান্তরিতার অভিমান।

—তুমি তিতিকে মেরেছিলে বুঝি ?

নাগেশ্বর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো—হাঁ।

আমার অনুমান ঠিক হলো! শিশু তিতির অনুরাগ হয়তো অপমানিত হয়েছে—কোন বয়োধন্যা কুপিতা নায়িকার অভিমানের চেয়ে এই অভিমান কম প্রখর নয়। আর নায়কের অনুশোচনাই বা কী কম! নাগেশ্বরের মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়—এক বিরহবিধুর শিশু রোমিওর মুখচ্ছবি।

—চল ঐদিকে একবার খুঁজে দেখি। নাগেশ্বরকে নিয়ে সারা আম-বাগানটা তালাস করে এলাম। কুঞ্জকরা জবাগাছের ভীড়ের ভেতর ঢুকলাম। তিতি নেই কোথাও।

—কই নাগেশ্বর, তোমার তিতি এদিকে আসেনি।

নাগেশ্বর বললো—হাঁ এইখানে আছে। ওকে পুঁতে দিয়েছে।

বুঝলাম। নাগেশ্বরের কথার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঘটনার ইতিবৃত্ত হঠাৎ বেজে উঠলো—পুঁতে দিয়েছে। অর্থাৎ তিতি আর নেই। তবু নাগেশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গিনীকে। সে আর সমাধিস্থা সঙ্গিনীকে যেন আবার হাত ধরে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে।

নাগেশ্বরকে আবার অনেক প্রশ্ন করলাম। সে তার সাধ্যমত উত্তর দিয়ে গেল। তিতির অসুখ হয়েছিল। তারপর চাকরেরা সবাই মিলে একদিন রাত্রে তিতিকে কাপড় জড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে বাগানের ভেতরে আসে। তারা সঙ্গে বড় বড় কোদাল আর লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল। তিতিকে বাগানে কোথাও পুঁতে রেখে গেছে তারা।

নাগেশ্বরের এই অন্বেষণের পেছনে আছে এই ক্ষুদ্র ইতিহাস।

একবার ভাবলাম নাগেশ্বরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই এবার। তিতির সমাধি খুঁজে বের করে আর লাভ কি? তার চেয়ে নাগেশ্বর চিরকাল জানুক—তিতি এই বাগানের কোন নিভৃতে মাটীর নীচে একাকিনী অভিমানিনীর মত বসে আছে। সে আর ধরা দেবে না।

কিন্তু নাগেশ্বর আজ যেন প্রতিজ্ঞা করেই বার হয়েছে। তিতি না দেখে ফিরবে না।

বললাম,—তিতিকে মাটীতে পুঁতে দিয়েছে। ও মরে গেছে। আর ওকে খুঁজে লাভ নেই নাগেশ্বর। তিতিকে আর পাওয়া যাবে না।

নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় পুঁতেছে?

—আচ্ছা, চল খুঁজে দেখি।

তিতির সমাধি খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এই বিরাট বাগানের কোথায় কোন্ নিভৃতে কয়মুষ্টি ধুলির সঙ্গে তিতি মিশে আছে কে জানে!

কত লতামণ্ডপ পার হলাম। বনবাদাড়ের আশে পাশে ঘুরে এলাম। একটা মরা পাতকোর কাছে দেখলাম নতুন রকম মাটীর ছোট একটা ঢিপি—কিন্তু তিতির সমাধি নয়—একটা খরগোস নতুন বাসা করেছে।

শেষে নাগেশ্বর নিজেই খুঁজতে লাগলো। আমি তার অনুগামী হয়ে রইলাম মাত্র। ঘুরে ঘুরে কদমের বনের কাছে এসেছি, নাগেশ্বর চুপ করে তাকিয়ে দেখছিল মাটীর দিকে। গাছতলায় পুরানো কদমের কেশর আর কাদা মাটী শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে সেখানে সে চেয়ে কী দেখলো সে-ই জানে। তারপর অন্য পথে এগিয়ে চললো।

আমরা এসে থামলাম একেবারে খালের জলের ধারে। নাগেশ্বর তার পকেট থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বের করে নানাভাবে ভাঁজ করলো—তৈরী হলো একটি কাগজের নৌকা। খালের জলে নৌকাটিকে ছাড়া

মাত্র বাঁশঝাড় থেকে একটা ব্যাকুল হাওয়ার দমকা তর তর করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাগেশ্বর তেমনি পরিতৃপ্তি ভরা দৃষ্টি দিয়ে কাগজের নৌকাটা দেখছিল। গত শ্রাবণেই বোধ হয় কোন একটি বর্ষণ সজল বৈকালে তারা দুজনে একসঙ্গে কাগজের নৌকা ভাসিয়েছিল।

নাগেশ্বর আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্বেষণ যেন সব দিক দিয়ে এতক্ষণে সার্থক হয়ে উঠেছে। সমাধিস্থা তিতি যেখানেই থাক্, নাগেশ্বর যেন কিছুক্ষণের জন্য তিতিকেই কাছে পেয়েছে। নাগেশ্বরের চোখে সেই শ্রাবণ বৈকালের মেঘঘন ছায়া পড়লো কিছুক্ষণের জন্য।

বর্ণচোরা

মাত্র ছ'বছর বয়স ছেলেটার ; মুখের চেহারা তবু এর মধ্যেই ঝামিয়ে গেছে। খুব রোগা। বয়স্ক মানুষের একটা ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরানো ; ছোট শরীরে অপরিমিত ধুতির ভার অনেক চেষ্টা করে গুঁজে গোঁজে দেওয়া হয়েছে। গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। হারাণ মাষ্টারের পেছু পেছু সুবাধ্য পোষা কুকুরছানার মত গোকুল সিঁড়ি বেয়ে জগৎবাবুদের কলকাতার বাড়ীর দোতালায় এসে উঠলো। দেশ থেকে ফিরছে হারাণমাষ্টার। হারাণ জগৎবাবুর ছেলেপিলেদের পড়ায় আর নিজে কলেজে পড়ে।

বাড়ীর সবাই চোখভরা কৌতূহল নিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো। হারাণ-মাষ্টার একটা বিবৃতি আউড়ে গেল। এই গোকুল না-কি সম্পর্কে জগৎবাবুর ভাইপো-গোছের কেউ হয়।

জগৎবাবুর সংশয় ঘুচলো না। গোকুলকে দু'চার বার প্রখর দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন—"উঁহু, ফটিকের ছেলে? কোন্ ফটিক?"

হারাণ।—আপনার জ্যেঠামশায়। মেজচৌধুরী নিত্যবাবুর ছেলে ফটিক।

জগৎবাবু।—কোন্ নিত্যবাবু? কোন্ জ্যেঠা?

হারাণ।—সেই যে সেটেলমেণ্টে কাজ করতেন; আপনাদেরই খালপারের সরিক। নিত্যবাবুর ভাই চৈতন্যবাবু, ইয়া পালোয়ানের মত চেহারা, ফৌজদারী মামলা করে ফতুর হলো। শেষে মলো যক্ষ্মায়।

জগৎবাবু।—ওসব কুলজী রাখ মাষ্টার। বল ছেলেটি কে?

হারাণ।—আপনি কি শোনেন নি, বিয়ের ক'মাস পরেই ফটিক পাগল হয়ে যায়। তার পর চারমাসের মধ্যেই মারা যায়। গোকুলকে চোখে দেখে যায় নি।

জগৎবাবু।—হুঁ তাতে হলো কি?

হারাণ।—ফটিকের বউ আঁতুড় থেকে বেরিয়ে মাত্র দেড়মাস বেঁচে ছিল। গোকুল এতদিন ছিল ফটিকের শাশুড়ীর কাছে। এবার বুড়ীও পটল তুলেছে।

জগৎবাবু।—বুঝলাম বক্সা, পাগলামি আর খুন-ডাকাতির একটি চারা ঝাড় থেকে তুলে নিয়ে এসেছ।

জগৎবাবুর স্ত্রী নন্দা এতক্ষণে কথা বললেন।—"এ রকম কপাল নিয়েও মানুষ সংসারে জন্ম নেয়! বাপকে খেলে, মাকে খেলে; যেখানে যায়— পিদিম নিভে যায়। ওর ঠাঁই হবে কোনখানে?"

হারাণ।—আমিও তাই বলছিলাম কাকীমা! দেখুন না, ভুগে ভুগে এই বয়সেই চেহারা কেমন···!

নন্দা।—চামচিকের মত।

জগৎবাবু।—বিড়িটিড়ি খায় বোধ হয়।

হারাণ-মাষ্টার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মনে মনে যেন সে একবার

হাতড়ে দেখলো এঁদের হৃদয়বৃত্তির রীডগুলি। ঠিক কোমল দেখে একটাতে টিপতে হবে; যদি কাজ হয়।

হারাণ হঠাৎ গোকুলের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"এ কি রে গোকু! এখনো চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছিস। জ্যেঠামহাশয়কে প্রণাম কর, আর ঐ যে জ্যেঠীমাও রয়েছেন।"

গোকুল এতক্ষণ যেন কাঠগড়ায় আসামীর মত দাঁড়িয়ে দুই কৌন্সুলীর তর্ক শুনছিল। কী বুঝেছে তা সে-ই জানে। হারাণের আকস্মিক নির্দ্দেশে গোকু চমকে উঠলো শুধু, কিন্তু আচরণে উৎসাহ বা সাড়া দেখা দিল না। হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি চুপ করে রইল।

সকলে চুপ করেছিল—থিয়েটারে সীন বদ্‌লাবার আগে যেমন লোকে কিছুক্ষণ উৎসুকভাবে নীরব হয়ে থাকে। জগৎবাবুর গলা ঘড় ঘড় করে উঠলো,—"হুঁ, প্রণাম করবে! ওকে বল এখনি রাস্তায় লোকের পকেট মেরে আনতে; দেখবে উৎসাহ।"

হারাণ।—আজ্ঞে হ্যাঁ, যেমন সাংঘাতিক মানুষের মধ্যে এতদিন ছিল। ওরকম হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবে কোনো মহৎ লোকের দয়া ও আশ্রয় পেলে মতিগতি ঠিক হয়ে যাবে, মানুষ হবে।

জগৎবাবু।—কিছু হবে না।

হারাণ।—ষ্টীমারে একজন সাধু গোকুর হাত দেখে বেশ ভাল ভাল কথা বললো। ওর অদৃষ্টে এবার অন্নদাতা-যোগ আছে আর অন্নদাতার না কি সৌভাগ্য-যোগ আছে।

জগৎবাবু ও নন্দা সহসা বলবার মত কোন কথা খুঁজে পেল না। তাঁদের বিরূপ ও বিরুদ্ধ মনের সংশয়ের একটানা রেশ তাল কেটে স্থির হয়ে গেল। হারাণ এবার সময় বুঝে তাক্ করে তার আসল বক্তব্য ঝেড়ে দিল—"আপনাদের কাছে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। যেমন ইচ্ছে রাখুন।"

জগৎবাবু।—আরে না না না। নিজেই হাফ-এ ডজন নিয়ে বিব্রত। শুধু দুটো খেতে পরতে দেওয়ার প্রশ্ন নয়। মানুষ করার দায়িত্ব। কে জানে—শেষে মানুষ না বনমানুষ হবে? তুমি ওকে অন্যত্র ব্যবস্থা করে দাও।

হারাণ।—বেশ তো, এখন দুটো দিন এখানে জিরিয়ে নিক্।

গোকুল থেকে গেছে। আজ দশদিন হলো। নন্দা রাগে প্রায় আত্মহারা হয়ে ঝড়ের মত জগৎবাবুর কাছে এসে ভেঙে পড়লো।—দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা হচ্ছে।

জগৎবাবু।—লক্ষণ দেখা দিয়েছে না কি?

নন্দা।—মৃগেনবাবুর মেয়েরা বাড়ী চড়ে এসে শুনিয়ে দিয়ে গেল—গোকুকে না কি আমরা কসাইয়ের মত কষ্ট দিচ্ছি। পেট ভরে খেতে দিই না, শীতে জামা দিই নি, বিছানা দিই নি···

জগৎবাবু।—কেন তারা এসব বললে?

নন্দা।—গোকু ছোঁড়া গিয়ে লাগিয়েছে—বিছুটীর চারা।

জগৎবাবু।—আচ্ছা, একটা কথা। সত্যিই কি ওকে ও সব দেওয়া হয় নি?

নন্দা রাগের মাত্রা রাখতে পারলেন না—"তুমি বেশী ভালমানুষী ফলিও না। ওকে সবই দেব ঠিক করেছিলাম। আজই দিতাম, শুধু কাল রাত্রে মাছ দিতে ভুলে গিয়াছিলাম। কিন্তু এইটুকু ছেলের হিসাবটা দেখলে। আজ ওকে খুন্তী-পেটা করবো।"

জগৎবাবু।—না, মারধর ভাল নয়।

*　　*　　*　　*

বাড়ীর আবহাওয়া গোকুলের উপদ্রবে অশান্ত হয়ে উঠেছে। হাঁপানী রুগীর মত দম টেনে টেনে চেঁচিয়ে কথা বলে। যত সব গেঁয়ো বুলি।

দাবী, বায়না, আবদার ক্রমে ক্রমে প্রখর হয়ে উঠছে। বকলে বা দু'এক ঘা চড়-চাপড় দিলে রক্ষা নেই—কদর্য কান্না আর চীৎকারে বাড়ীসুদ্ধ লোককে অতিষ্ঠ করে তোলে। আবদার ধরেছে—বই চাই। রাখু মীনু বোঁচা বই পড়বে, আমারও চাই।

হারাণ-মাষ্টার কান ম'লে পড়ার ঘর থেকে গোকুকে তাড়িয়ে দিল। গোকু রুখে এসে গড়িয়ে পড়লো রান্নাঘরে—নন্দার কাছে; তরকারীর খোসাগুলির ওপর শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে কান্না ধরলো। জলের গামলাটা উল্টে গেল! রাঁধুনী ঠাকুর চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গোকুকে চিলকোঠায় বন্ধ করে রাখলো।

নন্দা এবার নিঃসন্দেহ হয়েছেন—এ ছেলে বড় হয়ে বিভীষণ হবে। ও শুধু জানে কি করে নিজেরটা বাগাতে হয়। একে একে সব আদায় করেছে—ভিন্ন বিছানা পেয়েছে, গরম সোয়েটার পেয়েছে। সংগ্রামে আজ পর্যন্ত গোকুর পরাজয়-লাভ ঘটে নি; জয়ের তালিকা ক্রমশঃ ভরে উঠছে। একখানা বর্ণপরিচয়, একখানা ধারাপাত পেয়েছে—চীনে মাটীর সিংহ পেয়েছে এক জোড়া।

সব চেয়ে আশঙ্কার কথা, গোকু বিশেষ করে তিনজনের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—রাখু, মীনু ও বোঁচা। রাখুরা কখন কী খাচ্ছে, কোথায় গেল, কেন হাসলো—গোকুর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সজাগ হয়ে সব সময় পাহারা দিচ্ছে, এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, গোকু যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পায়। রাখু মীনু বোঁচা তেতালার ঘরে কপাট বন্ধ করে রেডিওর চাবি টানছে। গোকু ঘুম ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ওপরে ধাওয়া করে, মরিয়া হয়ে কপাটে লাথি মারে।

কাণ্ড দেখে নন্দা ভয় পাচ্ছেন সব চেয়ে বেশী। এই ভয়ই মাঝে মাঝে তাঁকে নিষ্ঠুর করে তুলছে। জগৎবাবু যেন বুঝেও কিছু বুঝছেন না।

গোকুর এই প্রতিযোগিতা শেষে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে!

গোকুর একটা নিঃস্বার্থ সত্তা আছে—শুধু একজনের সম্পর্কে! লালু—নন্দার কোলের ছেলেটি। গোকু যখন লালুকে আদর করে তখন তার সীমা থাকে না। লালুর পেটে নিজের মাথাটা ঘষে ঘষে গোকু হাসতে থাকে, লালুর ছোট ছোট পা দুটো মুখে পুরে নিয়ে গোকু নিজেই খুসীতে লাফাতে থাকে। লালুর হাতের কাছে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বার বার অনুরোধ করে—"আমার চুল ছেঁড় লালু, খিমচে দাও।"

নন্দা হেসে ফেলতেন।—"ও কি করছিস গোকু। অত বেশী হাসাস নি লালুকে।"

আনমনা হয়ে নন্দা কিছুক্ষণ গোকুর দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর চোখের ওপর কিছুক্ষণের জন্য বহুদূর আকাশকোলের এক টুকরা জলভরা মেঘের ছায়া পড়তো যেন। তেমনি আনমনেই শান্ত-কোমল-স্বরে গোকুকে বলেন—"যাও গোকু, ঝিকে বল, তেল মাখিয়ে তোমায় স্নান করিয়ে দেবে। আর দেরী করো না।।"

কিন্তু পর পর কতগুলি তিক্ত ঘটনার বিস্বাদে বাড়ীর মন বিষিয়ে উঠলো। গোকু ছাদের কার্নিশের ওপর দিয়ে হাঁটছিল; ঠাকুরটা উড়ে ভাষায় গোকুকে গাল দিয়েছে। জগৎবাবু ঠাকুরকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। নন্দাকে হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হলো। সামান্য একটা ছবি নিয়ে গোকু একা রাখু মীনু বোঁচার সঙ্গে নিদারুণ মারামারি করেছে। জাঁতি ছুড়ে মেরেছিল গোকু, মীনুর কপালটা কেটে গেছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

এ বাড়ীতে গোকুর থাকা আর চলবে না।

হারাণ-মাষ্টার খবর নিয়ে এল।—রাজচন্দ্র অনাথ আশ্রমেই ব্যবস্থা করা

হলো। জগৎবাবু কথাটা শুনেও খবরের কাগজের ওপরেই মাথাটা ঝুঁকিয়ে রাখলেন। নন্দার বুকটা আচমকা দুর্ দুর্ করে উঠলো।

অনেকক্ষণ পরে জগৎবাবু বললেন,—"একটা দিন ঠিক করে ফেল। কিন্তু দেখ, ও যেন জানতে না পারে কিছু। বেড়াবার নাম করে নিয়ে যেও। পরে একবার গিয়ে কাপড়-চোপড় বিছানা দিয়ে এস।"

মাত্র আর কটা দিন। গোকুর জন্যে একখানা আলোয়ান আর একজোড়া প্যান্ট কিনে আনা হয়েছে। রাখু, মীনু ও বোঁচাকে নন্দা একদিন বেদম মার দিলেন—"খবরদার যদি গোকুর সঙ্গে তোমাদের ঝগড়া করতে দেখি—গোকু একেবারে শান্ত হয়ে গেছে।"

হারাণকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন নন্দা,—"ও কিছু টের পেল না কি হারাণ?"

হারাণ।—কি করে পাবে?

নন্দা।—আজকাল সব সময় আমার পেছু পেছু ঘুরছে। খেলতে বললে বই নিয়ে বসে। নিজেই সময়মত স্নান করছে, খাচ্ছে। বোঁচা পাজিটা ওর খেলনাটা ভেঙে দিল, একটা কথাও বললে না।

হারাণ। নতুন জামা-কাপড় দেখে কিছু মনে করে নি তো।

নন্দা। আমার সত্যি ভয় করছে, ছেলেমানুষ! এখানে মন বসে গেছে—জানতে পারলে সত্যিই কি আর যেতে চাইবে?

হারাণ। না না, ওসব কিছু নয়।

সকাল বেলাটা বেশ ঝকঝকে সূর্য উঠেছে। বাড়ীতে কোলাহল নেই। বেশ মিষ্টি মিষ্টি দিন। তারই মধ্যে হারাণ-মাষ্টারের গলার স্বর কর্কশ উল্লাসে বেজে উঠলো—"ওরে গোকু, আজ আমি আর তুই চিড়িয়াখানা দেখতে যাব।"

জগৎবাবু খবরের কাগজ ফেলে উঠে পড়লেন। নন্দাকে গিয়ে ব্যস্ত

হয়ে জানালেন,—"আমি এখনি চললাম, অনেকগুলি জরুরী কাজ আছে। ফিরতে হয় তো বিকেল হয়ে যাবে।

নন্দার কোনো আপত্তি শোনবার আগেই জগৎবাবু চাদর কাঁধে ফেলে বেরিয়ে গেলেন। নন্দা যেন হিংস্র এক দুর্যোগের মুখে একা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর বিবর্ণ মুখের ছবিতে সেই ভয়াতুর ছাপ লেগে ছিল।

নন্দা ওপরতলা থেকে মিছামিছি নীচের তলায় একবার এলেন। আবার উঠলেন। গোকু বলেছে—"আমি আজ থেকে রাত্রে তোমার কাছে শোব, ভুতের ভয় করে।"

নন্দা একবার ভাবলেন—এখনি সেজমামার বাসায় চলে যাই। সন্ধ্যের পর ফিরে আসা যাবে।

দুপুরবেলায় হারাণ এসে নন্দার কাছে হেসে হেসে বললে—"এবার যাত্রা সুরু করি খুড়িমা।"

নন্দার গলার স্বর কাঁপতে লাগলো—"ওসব বুঝে ফেলেছে হারাণ। সারাটা সকাল আনাচে-কানাচে লুকিয়ে ফিরছে। ও যেতে চাইবে না। বুঝতে পেরেছে সব।"

হারাণ।—আরে না খুড়িমা, বৃথা আশঙ্কা করছেন।

নন্দা।—ছেলেমানুষ, আপন-পর-জ্ঞান নেই। এটা পরের বাড়ী বলে যদি বুঝতো তবে কোনো ভাবনা ছিল না।

সমস্ত বাড়ীর মনটা যেন পাকা শিকারীর মত সতর্ক হয়ে আছে—গোকু যেন টের না পায়। নন্দা আবার হারাণকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আশ্রমে মারধর করে না তো হারাণ?"

—আজ্ঞে না খুড়িমা! সুন্দর সুন্দর মাদুর বুনতে শেখায়।

নন্দা চুপ করে বসে রইলেন। পড়ার ঘরে গোকু ঘুমিয়ে পড়েছে। হারাণ জাগিয়ে ওঠাবার জন্যে চলে গেল।

নন্দার কি রকম একটা বিশ্বাস ও আশঙ্কা ছিল—গোকু যেতে চাইবে না। বোধ হয় সব ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছে। কিন্তু থেকেই বা কি হবে ওর? এই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছককাটা অন্তরঙ্গতার গণ্ডী—এর সীমানার বাইরেই ওকে থাকতে হবে। গোকুর অনাদৃত মনুষ্যত্ব সিঁদেল চোরের মত শুধু প্রবেশের পথ খুঁজবে। তার চেয়ে···।

হারাণ অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে ভীরুর মত চুপি চুপি এসে বললে—"সব বুঝে ফেলেছে খুড়িমা! এই দেখুন পুঁটলি বেঁধে সব গুছিয়ে রেখেছে—আলোয়ান, কোট, ধুতি, প্যান্ট, চীনেমাটির সিংহ, ধারাপাত, বর্ণপরিচয়, সিগারেটের রাংতা, গণেশের ছবি। সব কিছু এক করে জড়ানো একটা পুঁটলি, ফিতে দিয়ে আলগা করে বাঁধা। কাঁচা হাতে ফিতের গেরোটা ভাল করে ফাঁসে নি।"

নন্দা বিমূঢ়ার মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। দরজাটা হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। বেশ চেঁচিয়েই বললেন—"যাও তোমরা এবার সরে পড়, আর দেরী করো না। শেষ পর্যন্ত এ রকম একটা পরাজয়ের অপমান সইতে হবে—ঐটুকু ছেলের কাছে! যাক, তবু ভাগ্য ভালই বলতে হবে—সময় থাকতে সরিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য! কী ভয়ানকভাবে ঠকিয়ে বাগিয়ে ধূর্ত লুঠেরার মত চলে গেল ছেলেটা।"

মানশুল্কা

ট্রাফিক সুপার সাহেব মাঝে মাঝে তাঁর শিকার-করা বাঘের শবটাকে ষ্টেশনের মুসাফিরখানায় শুইয়ে রাখতেন, আর দর্শকের সমাগমে নিয়েট একটা ভীড় লেগে থাকতো সমস্তদিন। আজকেও একটা ভীড় লেগেছে—অনেকটা সেই রকম। লোক ছুটে আসছে একটা বাঘ দেখার কৌতূহলের তীব্রতা নিয়ে। স্কুলের ছাত্রেরা সাইকেল চালিয়ে এসে সজোরে ব্রেক কষে থামছে, সাইকেলগুলিকে সশব্দে রেলিংয়ের ওপর ঠেসে দিয়ে ভীড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে মাথা ঢোকাচ্ছে। ভেলকিওয়ালার ডুগডুগি বাজলে পাড়ার ছোট ছেলেপিলেরা যেমন দুরন্ত এক প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে—বরাচক ষ্টেশনের মুসাফিরখানায় তেমনি ভদ্র ভদ্রেতর ছেলে বুড়ো সবাই প্রায় দৌড়ে দৌড়ে আসছে। তর সইছিল না কারও।

কয়েকটা কুলি ওজন-কলটার ওপর চড়ে বসে এই দৃশ্য দেখছিল—ঠিক ভীড়ের মাঝখানে আসর পড়েছে। আপ-ডাউন ট্রেনগুলি এসে আবার

চলে গেছে, তবু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এক অপার্থিব আমোদের পুলকে রোজগারের তাড়না ভুলতে বসেছে তারা।

দর্শকদের লালায়িত দৃষ্টিগুলি ভিজে চকচক করছিল। ভীড়ের মাঝখানে বসেছিল তিনজন কনেষ্টবল; মাঝে মাঝে জনতার উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে মৃদু ধমক হাঁকছিল। কিন্তু তাদেরও হাবভাব একটা কৃতিত্বের ভারিক্কি দেমাকে ভরে উঠেছিল; যেন কী ভয়ানক এক কীর্তিকে তারা লাগাম বাগিয়ে ধরে রেখেছে।

কনেষ্টবলদের কাছে বসেছিল একটা বাউড়ী জাতের মেয়ে—বছর কুড়ি বয়স। একটা নতুন থান কাপড় পরে বসে আছে। মেয়েটার নাম আগো। ওকে আজ পুলিশের হেপাজতে সদরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জনতা সাধ মিটিয়ে দেখছিল—এই সেই জলাপুর থানার রেপকেসের বাদিনী। আজ তিনদিন ধরে মানুষের জীববৃত্তির সেই হিংস্র বিপর্যয়ের কাহিনী শুনে চারদিকের দশটা গাঁয়ের শুদ্ধাত্মা শিউরে উঠেছে; সাহাদের নতুনবাড়ীর দিঘী কাটাতে একদল বাউরী মেয়ে-পুরুষ মজুর এসেছিল। আগো এসেছিল তাদেরই সঙ্গে আর কাজ করছিল ভালই; কিন্তু হঠাৎ দুদিন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর এই সেদিন নিজেই থানায় এসে রিপোর্ট দিয়ে গেছে। তিনটে পানওয়ালা গ্রেপ্তার হয়েছে—আগো তাদের ঠিক ঠিক সনাক্ত করেছে! সেই বিচিত্র রতিচৌর্যের কাহিনীর নায়িকা আগো এইখানে সশরীরে উপস্থিত। ভীড়ের মধ্যে গুঁতোগুতি আর মাথা ঠোকাঠুকি আরম্ভ হলো।

আগো শান্তভাবে বসেছিল। সহজ ভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল জনতার কাণ্ডকারখানা। আর বড় লাজুক হাসি হাসছিল মেয়েটা—এইটাই দেখতে অদ্ভুত লাগছিল। জনতার দৃষ্টির শরজালে আচ্ছন্ন হয়েছে আগো; কিন্তু তবুও তাতে ওর গায়ে যেন কোন জ্বালা লাগছিল না।

অপরিচিত এক পৃথিবীর বাসরঘরে যেন সকলে মিলে জোর করে তার ঘোমটা টেনে নামিয়ে দিয়েছে। তাই আগো শুধু হাসছিল।

সন্ধ্যে হবার একটু আগে থাকতেই ভীড় কমতে আরম্ভ করলো। শেষ রাত্রির ট্রেন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। একজন সেপাই হালুই-করের দোকান থেকে কিছু খাবার এনে রাখলো আগোর সামনে।—খেয়ে নে; যদি পেট না ভরে তো বলিস্ আরো এনে দেব। আজকের দিনটার মত মরে টরে যাস্নি বাবা। আমাদের চাকরীটা খাস্নি।

আগোর খাওয়া শেষ হলো। ভীড় তখন আর নেই। সেপাই তিনজন কম্বল পেতে গড়িয়ে পড়লো।

আগো একটা অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করছিল আর একটা লজ্জাকাতর বেদনার দৃষ্টি দিয়ে সেপাইদের দিকে তাকাচ্ছিল বার বার। সেপাইরা ব্যাপারটা বুঝলো; কিন্তু ততটা প্রশ্রয় দেবার মত উদারতা দেখাতে কেউ রাজী নয়। বুড়ো গোছের সেপাইটা বললো,—তোমাকে বাইরে যেতে হ'লে ঐখানে আমাদের সামনেই যাও। দূরে যেতে পারবে না।

রুষ্ট সাপের মত আগোর চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠলো। প্রায় একটা চীৎকার করে প্রতিবাদ জানালো।—আমাকে গরু পেয়েছ নাকি?

সেপাই তিনজন একসঙ্গে পাল্টা গর্জ্জন করে ধমক দিল।—ওরে আমার পর্দ্দানসীন রে! লজ্জার চোট দেখ একবার! যা হুকুম করছি হারামজাদি চুপচাপ করে যা; নয় এইখানে বসে থাক্, উঠতে পাবি না।

আগো চুপ করেই বসে রইলো।

শুয়ে শুয়ে সেপাইরা আবার আগোকে প্রশ্ন করে চললো। সত্যি বল্‌তো, পানওয়ালারা তোকে টাকা দিয়েছিল, না এমনি...।

আগো মাথা নেড়ে জানালো—না টাকা দেয় নি।

—তুই চেয়েছিলি?

—হাঁ।

—থানাতে এই কথা বলেছিস ?

—হাঁ।

তিন জনেই একসঙ্গেই হেসে উঠলো। —তা হলে এই কেস আর ঠিকেছে ! উল্টে তোরই কয়েদ না হয়ে যায়।

বুড়ো সেপাইটা আনমনা হয়ে কিছুক্ষণ আপশোষ করলো।—সত্যিই এসব বড় জবরদস্তির সওদা। হাঁ, ফুস্‌লে ফাস্‌লে অনেক বদমাস অনেক কাণ্ড করে তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু এসব কোন্ জুলুম ? গুণ্ডাদের পয়সা হয়েছে আজকাল, থানাও কিছু বলে না, নইলে—

তারপর আগোর দিকে তাকিয়ে মুখটা ভেঙ্‌চে বললো। —তোমার অদৃষ্টে বারটা বেজে গেল। এরি মধ্যে হয়েছে আর কী ? আরও কত বেইজ্জতি আছে দেখবে। ডাক্তারিরে, সওয়ালরে, জেরারে···। কেন এসেছিলি বাবা চাক্‌রি করতে এ বয়সে, এই বিদেশে ?

রাত্রি দশটা। বরাচক ষ্টেশনের [illegible] তিনটি সতর্ক আইনের দূত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন তখন আসানসোল পৌছে আবার হাঁসফাঁস করে অন্ধকারে পাড়ি দিয়েছে কলকাতার দিকে। একটা থার্ড ক্লাস কামরায় বেঞ্চের নীচে কুঁকড়ে শুয়েছিল আগো। চলন্ত ট্রেনের শব্দের আভরণ বাজছে স্বচ্ছন্দে—তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে আগোর হৃদ্‌পিণ্ডটা আসন্ন মুক্তির আশায় ধুকপুক করছে।

এক মারোয়াড়ী দশ বারটা কমলা লেবুর ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে কামরাতে ঢুকলো। বেঞ্চের তলায় ঝুড়িগুলি সাজিয়ে রাখতে গিয়েই বাধা পেল। তারপর নীচু হয়ে বেঞ্চের তলায় উঁকি দিয়ে সরোষে একটা ধমক দিল।—এই চোট্টা, নিকাল্ নীগ্‌গির নইলে চেকার ডেকে এক্ষুনি ধরিয়ে দেব।

মারোয়াড়ী বেঞ্চের ভেতর হাত ঢোকালো মানুষটাকে টেনে বার করার জন্য। ট্রেনের অন্য আরোহীরা হাসির সোর তুলে চেঁচিয়ে উঠলো।
—আরে হাঁ হাঁ হাঁ, করেন কি ?

মারোয়াড়ী। —কী ব্যাপার ?

আরোহীরা। —মেয়ে মানুষ শুয়ে আছে। ওর টিকিট নেই।

মারোয়াড়ী—হা পরমেশ্বর! এমনি করেই লাজ লেহাজ বিসর্জ্জন দিতে হয়!

মারোয়াড়ী একটা ধিক্কার দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সারারাত ট্রেন চললো—আসানসোল থেকে কলকাতা। বেঞ্চের দুপাশে ওপর থেকে দশজোড়া পা সাপের মত ঝুলে রইলো। যতদূর সম্ভব আগো তার শরীরটাকে এই সর্পিল সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বৃথা চেষ্টা করলো। সুযোগ পেলেই নাগরা-পরা পাগুলি সকলের অলক্ষ্যে চুপে চুপে ক্ষুধার্ত্ত নখরের মত অন্ধকারের মাংস খুঁজে বেড়ায়। কখনও বা বেপরোয়া আঁকড়ে ধরে—পিষে দেয়। শ্মশানের শবকেও বোধ হয় এতটা উপদ্রব করতে কারও সাহস হতো না।

একটা রেলের মিস্তিরি পাশের বেঞ্চে ব'সছিল। হঠাৎ একটা রসি-কতার দমকা লেগে লাফিয়ে উঠলো; তারপর বেঞ্চের তলার দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে চেঁচাতে লাগলো। —বিচ্ছু! বিচ্ছু! ইয়া বড় বিচ্ছু! শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়।

গাড়ীশুদ্ধ আরোহীর দল হো হো করে হেসে উঠলো।

ভোর বেলা। হাওড়া ষ্টেশনের সাত নম্বর প্লাটফর্ম্মের ফটক দিয়ে যাত্রীরা বোঁচ্‌কা-বুঁচকি নিয়ে টিকিট দেখিয়ে পার হচ্ছে। সেই স্বচ্ছন্দ জনপ্রবাহের সঙ্গে আগো এগিয়ে চলেছিল। বাধা পড়লো ফটকে। চেকার

টিকিটের দাবী জানিয়ে আগোর মুখের দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইলো। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে আগো যা উত্তর দিল তাতে কোন অর্থ স্পষ্ট বোধগম্য হল না।

—খাড়া রহো! টিকিট চেকারের হুকুমে আগো একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রইলো। চেকার মশায় আগোর গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে বাকী যাত্রীদের টিকিট চেক করে গেটের কাছে জনারণ্যের ঝড় সামলাতে লাগলেন। ভীড় ফাঁকা হয়ে গেলে আবার এদিকে মনযোগ দিলেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণে গোঁপের ডগা চিবিয়ে দুবার হাসলেন। ইতিউতি দুবার তাকালেন। তারপর হাতের পাঞ্চটা দিয়ে আগোর পিঠে আস্তে একটা ঠোকর দিয়ে বললেন। —জলদি ভাগ্ এখান থেকে। পুলিশে ধরে ফেললে আর ছাড়বে না।

আগো একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। তার মুখের ভাবে মনের কথা আভাষে বোঝা যায়। শুধু পানওয়ালারাই নয়, দুনিয়ার মানুষের জীবাত্মা যেন এক জুলুমের আনন্দে মতিচ্ছন্ন হয়ে আছে। শুধু জোর আর জোর। এ ছাড়া কি অন্য ব্যবহার ভুলে গেছে সবাই? কিন্তু চাইলেই তো অনেক কিছু দেওয়া যায়, বললে অনেক কিছু শোনা যায়, অনুরোধে অনেক কিছু বিনিময় করা যায়। কিন্তু এ কোন্ রীতি? শুধু জোর আর জবরদস্তি। বরাকরের বান-ডাকা জলের মত এই ব্যবহার যেমন ঘোলাটে তেমনি অবুঝ ও উন্মত্ত।

সহর কলকাতা—পথের পর পথ, শুধু চলার জন্যই, কোন গন্তব্য বোধ হয় নেই। তবু অতি বিচিত্র এই জনপদের রূপ। বর্ণ শব্দ গতি ও বেগ আগোর দেহে মনে এক নতুন পরিচয়সুখের আবেশ ভরিয়ে তুললো। বরাচক ষ্টেশনের কর্কশ জনতার মত এই সহর শুধু তারই দিকে লোলুপ চক্ষে তাকিয়ে নেই। এক ঐশ্বর্য্যের মেলায় সবাই যেন ঠাঁই পেয়েছে। সবাই

পাশে পাশে চলে, কিন্তু কেউ কারো নয়। সাহাবাবুদের দিঘী, বরাচক ষ্টেশন, রাত্রির ট্রেন, হাওড়ার সাত নম্বর ফটক—একে একে সব ঘটনাই মনে পড়ে। সেখানে সর্ব্বত্র যেন গামছা দিয়ে মুখ-হাত-পা বাঁধবার জন্য একটা আয়োজন সর্ব্বদা ওৎ পেতে বসে আছে। কিন্তু সহর কলকাতা সে রকম নয়। আগো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বলাৎকৃতা নারীত্বের দুরপনেয় অভিমানের জ্বালা কিছুক্ষণের জন্য আগো ভুলে গেল।

আগো হেঁটে চললো—সকাল থেকে দুপুর তারপর বিকেল। রাস্তার ধারে একটা কল থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে—তার তলায় একটা ষোষ আরামশয়ানে শুয়ে গায়ে জল নিচ্ছে। খুব তেষ্টা পেয়েছিল আগোর। জল খাবার চেষ্টায় কলের দিকে এগিয়ে যেতেই ষোষটা শিং নেড়ে ঢুঁস তুললো। আগো সরে গেল।

একটা গাড়ীবারান্দার ছায়ায় অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত আগো দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ চোখে পড়ল—একটু দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে তারই দিকে তাকিয়ে। রুগ্ন বকের মত শীর্ণ চেহারা—মাথায় বড় বড় চুল, হাতে একটা ছড়ি। আগোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটা হাসলো। অতি অন্তরঙ্গতায় মাখা কালো কালো দাঁতে হাসি ঠিক্‌রে পড়লো। পান খেকো লাল জিভটাও দেখা যায়—কেমন ঘেয়ো ঘেয়ো।

এমন সুন্দর সহরে এই নেকড়েটা এল কোথা থেকে? গত তিনটি কালরাত্রির আতঙ্ক আবার আগোকে ভাবিয়ে তুললো। আবার অন্য পথে ঘুরে যেতে হল আগোকে।

পথে যেতে যেতে বার বার পেছনে তাকাতে হয়। লোকটা প্রেত-শরীরের মত ঠিক পেছু ধাওয়া করে চলেছে। চোখাচোখি হলেই কালো দাঁতে হাসি চমকে ওঠে। এক এক সময় আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। আগোর মন থেকে আশঙ্কার ভার নেমে যায়।

কারখানা গোছের একটা বাড়ীর ফটকের সামনে আগো নিজেই আবার একটা ভীড় জমিয়ে তুলল। দারোয়ানেরা জিজ্ঞাসা করলো।—তুমি চাইছ কি ?

আগো।—গির্জা যাব কোন্ পথে ?

—কেন ?

—খৃষ্টান হব।

দারোয়ানেরা গালাগালি দিয়ে উঠল। —বলে কি ! খচ্‌রি কাঁহাকা। তার চেয়ে বিলেত চলে যা, সেখানে তোর শ্বশুরের বেটা বসে আছে।

দারোয়ানদের হুমকিতে আগো আবার পিছিয়ে এল। সুমুখে তাকাতেই চোখে পড়ল—কালোদাঁত লোকটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

•

আবার সন্ধ্যা। ময়দানের ধারে একটা গাছতলায় বসেছিল আগো। কাল রাত থেকে খাওয়া নেই। অবসাদে শরীরটা পাথরের মত অনড় হয়ে এসেছে। তেষ্টায় গলার নালিটা শুকিয়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরে আছে।

গির্জের ফটকটা কী প্রকাণ্ড ! সমস্তক্ষণ বন্ধ থাকে ! সেখানে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছে আগো। ভেতর ঢোকবার সাহস হয়নি।

বৈশাখের সূর্য পশ্চিমে নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। গির্জের ঘণ্টা অনেকক্ষণ বেজে বেজে থেমে গেছে। চৌরঙ্গীর দালানগুলির কার্নিসে অলক্ষ্য কোন পোড়াগ্রহের সিঁদুরে জ্যোৎস্না মাখামাখি হয়ে আছে। আগোর জীবনে এই সন্ধ্যা সম্পূর্ণ অভিনব। গরু চরিয়ে শালের ডাঙ্গার কাটুরে পথ ধরে ঘরে ফেরার ক্লান্ত সন্ধ্যা নয়। শব্দের হর্ষে সহরের প্রাণ যেন দিনের শেষে নতুন করে ঝুমুর গেয়ে উঠেছে।

তেলেভাজার ঝুড়ি নিয়ে, কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে একটা লোক নিকটেই দোকান সাজিয়ে বসলো। আগো তার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ

ফিরিয়ে নিল। তারপর কখন ঘুমে চোখ বুঁজে এসেছে, সে নিজেই জানে না।

ভুল ভেঙ্গে গেছে আগোর। এত রোশনাই, এত সুশব্দ, এত হাসি-খুসি—প্রকাণ্ড একটা কল চলছে শুধু। এও আর একরকমের একটা উল্টোপুরী—শুধু পথ আছে আশ্রয় নেই। এখানে দিল্ নেই—তাই দিল্লগিও নেই। ইজ্জৎ নেই—তাই ইজ্জৎ হারাবার ভয়ও নেই। গায়ে পড়ে উপদ্রব করে না—ডেকে নিয়ে অপমানও করে না। শুধু প্রয়োজনহীন মাটির ঢেলার মত পড়ে থাকা। সহরের এত বড় ভীড়টা প্রকাণ্ড শূন্যতার মত আগোর কাছে বোধ হল। বড় ফাঁকা মনে হতে লাগল।

একবার আচমকা তন্দ্রা থেকে চোখ মেললো আগো। তেলেভাজার পশারীটা তখনও কুপি জ্বালিয়ে বসে আছে। তার সামনে বসে আছে সেই লোকটা—ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে খাবার খাচ্ছে। নজর পড়তেই লোকটার কালো দাঁত উদার আনন্দে হাসতে লাগলো।

আগো এবার আর চোখ ফিরিয়ে নিল না। আগো শুধু তাকিয়ে দেখছিল—লোকটার মুখটা ধীরে ধীরে কেমন সুন্দর হয়ে উঠছে। হাসিটিও বেশ। ওর মধ্যে যেন একটা আশ্রয়ের বাতি মিট্ মিট্ করে জ্বলছে।

ঠিক তাই। আজ সকাল থেকে এই সমাদরের আহ্বান তার পেছু পেছু ঘুরে ফিরেছে। কতক্ষণ থেকে ডাকছে। আগো তার অবহেলার ভুল বুঝতে পেরে একটু অনুতপ্ত হল।

লোকটা হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়ালো। আগো গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার হাতে হাত রাখলো। সহৃদয় কলকাতার প্রাণ যেন তার সামনে হেসে দাঁড়িয়ে আছে।

কতটুকু ক্ষতি

আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেন হন্তদন্ত হয়ে স্বাক্ষর পত্রিকার অফিসে ঢুকলো। শ্রীমন্তের মুখের দিকে তাকিয়েই সম্পাদক অক্ষয় বাবু বুঝলেন—পর্ব্বতো বহ্নিমান্। এই রুচিমান শিল্পীর নিষ্ঠার পর্ব্বতে কোন্ বহ্নির স্পর্শ দাবানল সৃষ্টি করেছে, অভিজ্ঞ সম্পাদক অক্ষয় বাবুর কাছে সে রহস্য অজানা ছিল না। আর্টিষ্ট শ্রীমন্তকে তিনি আজ চার বছর ধরে এই মূর্ত্তিতেই দেখে আসছেন। মিষ্টি কথার বর্ষা নামিয়ে এই উত্তপ্ত মূর্ত্তিকে কিভাবে ঠাণ্ডা করে দিতে পারা যায়, সেই কৌশল তাঁর কাছে চার বছরের নিয়মিত চর্চ্চায় এখন নিছক একটা অবলীলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমন্ত আর্টিষ্ট যতই রাগে গর্জ্জন করুক, ভয় দেখাক, অনুরোধ করুক—সম্পাদক অক্ষয় বাবু বিচলিত হন না কিছুতেই। কিন্তু আর্টিষ্ট শ্রীমন্ত এত বিচলিত হন কেন? কেন আজ চার বছর ধরে একটা বিক্ষোভের ঝড়ে তার মনের শান্তি বিপর্য্যস্ত হয়ে আছে?

শ্রীমন্ত আর্টিষ্টের বিদ্রোহী মূর্তিটা একটা চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়েই সম্পাদক অক্ষয় বাবুকে যেন চ্যালেঞ্জ করলো।—আবার আপনি ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তর তোলা একটা লক্কড় ফটো ছেপেছেন। বিজয় ফটোগ্রাফারের এলবামটাকে যদি আপনি একটা রত্নদীপ মনে করে থাকেন, তবে তাই করুন; কিন্তু আমাদের বাদ দিন। প্রতি মাসে ঐ এলবাম থেকে এক একটি ঘুঁটে পোড়ানো রত্ন দিয়ে আপনার স্বাক্ষরকে সাজিয়ে বার করুন। আর্টিষ্টদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিন। বাস্— স্বাক্ষরকে যদি রাখতে হয়, তবে এক নৌকায় পা দিতে শিখুন। তেলে-জলে মেশাবার চেষ্টা করবেন না। হয় আর্টিষ্ট নয় ফটোগ্রাফার—এর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। বলুন।

উত্তরে সম্পাদক অক্ষয় বাবু মৃদু হেসে যথাসৌজন্যে শুধু সিগারেটের ডিবেটা শ্রীমন্তের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন।—আসুন।

একটা সিগারেট অবশ্য তুলে নিল শ্রীমন্ত, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে প্রসঙ্গ থেকে সহজে রেহাই দিল না।—না অক্ষয়বাবু, আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই আপনার উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য? অক্ষয়বাবু তাঁর সম্পাদকীয় জীবনে এই প্রথম একটা অদ্ভুত কথা শুনলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট যেন একটা প্রচণ্ড ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছে। উদ্দেশ্য? সম্পাদকের উদ্দেশ্য? পত্রিকার উদ্দেশ্য? আজ চার বছর ধরে স্বাক্ষরের মত বাংলা পত্রিকার অন্তর্লোকে আনাগোনা করেও যে-মানুষ এখনো পত্রিকার উদ্দেশ্য জানবার কৌতূহল রাখে, তার জন্য কার না দুঃখ হয়? সত্যি, শ্রীমন্তের জন্য বড় দুঃখে হাসছিলেন অক্ষয়বাবু।

শ্রীমন্ত বললো।—সমাজ সাহিত্য ও শিল্প প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন, অথচ একটা নীতি, একটা লক্ষ্য, একটা রুচি………।

একটা সমবেদনার উচ্ছ্বাসেই বাধা দিয়ে অক্ষয়বাবু বললেন।—আছে আছে, সব আছে শ্রীমন্তবাবু।

শ্রীমন্ত।—ফটোর নীচে আবার লিখে দিয়েছেন—ফটোশিল্পী বিজয় গুপ্ত। ছি ছি, কী ভাল্‌গারিজম্‌ মশাই। ফটোগ্রাফার হলো শিল্পী। আরশুলা হলো পক্ষী? কুত্তার নাম বাঘা? কানার নাম পদ্মলোচন। মোষের নাম মহাশয়?

অক্ষয়বাবু।—চা খাবেন? তার সঙ্গে টোস্ট? মরিচ দিয়ে? কেমন?

বহ্নিমান্‌ শ্রীমন্ত একটু স্তিমিত হয়ে এল। অনুযোগের সুরে বললো।—না, এসব বড় অন্যায় করছেন অক্ষয়বাবু। না দেখছেন পত্রিকার প্রেস্টিজ, না দেখছেন আমাদের মানসম্মান! কী পদার্থ আছে ঐ ফটোতে? বিজয় গুপ্তের তোলা ফটো, তার নাম আবার—'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'। হাসালেন অক্ষয়বাবু।

অক্ষয়বাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন।—অবশ্য আপনাকে জানাতে বাধা নেই, ঐ ফটোটার খুব demand হয়েছে। নিউ-ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি আজই এসে ফটোগ্রাফারের ঠিকানা নিয়ে গেছে—ওরাও ফটোটা ছাপাতে চায়।

শ্রীমন্ত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে উল্লসিত হয়ে উঠলো।—এই তো! এইখানেই চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের দেশের যা-কিছু বিদ্‌ঘুটে, বিদেশীদের কাছে তারই আদর বেশী। আজগুবী না হলে ওরা পছন্দই করবে না। নইলে ধরুন, 'বন্যমার্জ্জারীর প্রেমাবেশ' নামে মিস্‌ মরুলতা মজুমদারের এমন উঁচুদরের নৃত্যটা বিদেশীদের কাছে কোন আদরই পেল না। অথচ, জংলী সাঁওতালী নাচ দেখে ওরা মুগ্ধ হয়ে যায়। বিদেশী রুচির কথা আর বল্‌বেন না। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। ওরাই বিজয় গুপ্তকে চিনেছে।

অক্ষয়বাবু কিছু একটা বলবার জন্য মনে মনে তৈরী হচ্ছিলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট আবার প্রশ্ন করলো।—একটা ফটোর জন্য কত দক্ষিণা দেন বিজয় গুপ্তকে ?

অক্ষয়বাবু।—সাড়ে চার টাকা।

শ্রীমন্ত বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকালো।—সাড়ে চার টাকা! লোকে তিন আনা পয়সা খরচ করে ষোল নম্বর বাসে চড়ে গড়িয়া পৌঁছে একটা খালের ধারে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকালেই স্পষ্ট দেখতে পাবে—ফাগুন লেগেছে বনে বনে। তার জন্য সাড়ে চার টাকা? অপব্যয়।

ফটোর মূল্য সাড়ে চার টাকা শুনে মনে মনে একটু খুসী হয়ে উঠছিল শ্রীমন্ত। অক্ষয়বাবু—কিন্তু মনে মনে ঠিকই জানছিলেন এবং দুঃখ করছিলেন—বিজয় গুপ্তকে গুণে গুণে দশটা টাকা দিতে হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় স্ট্র্যাটেজি নামে একটা মনস্তাত্ত্বিক কৌশল আছে। দক্ষিণার ব্যাপারে তিনি দ্বন্দ্বী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের আগ্রহের ওপর প্যাঁচ দিয়ে একটা তত্ত্বকে সফল করে তুলতে জানেন অর্থাৎ অল্পে সুখমস্তি।

সুতরাং অক্ষয়বাবু আবার আরম্ভ করলেন।—আপনার আঁকা ছবিটার মর্ম্ম কিন্তু কেউ বুঝতে পারলো না শ্রীমন্তবাবু। অবশ্য পিওর আর্ট বোঝবার মত লোক এই পোড়া বাংলা দেশে………।

শ্রীমন্ত বাধা দিল।—কী বলছেন অক্ষয়বাবু? পৃথিবীতে যাঁকে একমাত্র সত্যিকারের আর্ট-সমালোচক বলে জানি, সেই অধ্যাপক ত্রিদিব ভট্চাজ এই ছবি সম্বন্ধে কী লিখেছেন জানেন? তিনি লিখেছেন—"এই ছবির মধ্যে যে অব্যয়ীভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্বদেশের ও সর্বযুগের রস। সৃষ্টি একদিন মুছিয়া যাইবে, কিন্তু শিল্পী শ্রীমন্ত সেনের আঁকা এই অত্যাশ্চর্য ছবিটার আত্মার কখনো বিনাশ হইবে না।"

উৎসাহিত হয়ে অক্ষয়বাবু বললেন,—ঠিক কথা। খাঁটি কথা।

এতক্ষণে জিনিষটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগে এতটা বুঝতে পারিনি। ছবির নাম দিয়েছেন—'স্বর্গীয় মদের ফেনা', অথচ আকাশে একটা ভাঁড়ের মত জিনিষ উপুড় হয়ে রয়েছে।

শ্রীমন্ত।—হ্যাঁ, ওটা হলো চাঁদ।

অক্ষয়বাবু।—আর ভাঁড়ের মুখ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা উথ্‌লে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে কেন?

শ্রীমন্ত।—হ্যাঁ, ওটা হলো জ্যোৎস্না।

অক্ষয়বাবু।—আশ্চর্য্য, আমি সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি শ্রীমন্তবাবু। কী যে বলবো, শুধু বলতে ইচ্ছে করছে—আশ্চর্য্য। হাঁ, আপনার প্রাপ্য দক্ষিণাটা নিয়ে যান। এই নিন—আট টাকা দিলাম আপনাকে।

শ্রীমন্ত অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ প্রতিবাদ করার মত কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না।—আট টাকা? বেশ তাই দিন। একটু ইতস্ততঃ করে টাকা কয়টা পকেটে পুরে সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে বের হয়ে এল শ্রীমন্ত।

ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন অক্ষয় বাবু। ঘরে ঢুকলো ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত। দ্বিতীয় কিস্তি একটা সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুত হয়ে রইলেন অক্ষয় বাবু।

বিজয় গুপ্ত বললো।—আবার আপনি জলছবি ছাপতে আরম্ভ করেছেন! স্বাক্ষরের সুনাম আর রইল না। আপনার পত্রিকা উঠে যাবে, অবধারিত।

অক্ষয় বাবু বিস্ময়ের ভান করে প্রশ্ন করলেন—জল ছবি?

বিজয় গুপ্ত।—হ্যাঁ স্যর, শ্রীমন্ত আর্টিষ্টের আঁকা ছবি। কী হয়েছে ওটা? স্বাক্ষরের মত কাগজে যদি ঐসব রঙীন রাবিশ ছাপান, তবে আমাদের বাদ দিন। আর্টিষ্টদেরই মাথার মণি করে রাখুন আপনি।

অক্ষয় বাবু লজ্জায় জিভ কাটলেন।—ছিঃ, ওরকম করে বলবেন না বজয় বাবু। বিদেশের গুণী আর রসিকেরা শ্রীমন্ত সেনের ছবির কদর জানে। আজই নিউ ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি এসে 'স্বর্গীয় মদের ফেনা' ছাপবার জন্য তিনশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে শ্রীমন্ত সেনের অনুমতি নিয়ে গেছে। অথচ আমরা ঐ ছবির কতটুকু মূল্য দিতে পেরেছি, পাঁচটা টাকা মাত্র। এই তো?

বিজয় গুপ্তের উত্তেজনা হঠাৎ কেমন মিইয়ে এল। নেহাৎ অজ্ঞাত সারেই একটা সমবেদনার আভাষ যেন তার কথার মধ্যে ফুটে উঠলো।—মাত্র পাঁচ টাকা, সে কী অক্ষয় বাবু?

অক্ষয় বাবু।—হ্যাঁ বিজয় বাবু, এমন একজন আর্টিষ্টের আঁকা ছবির মূল্য পাঁচ টাকার বেশী দেবার সামর্থ্য নেই আমাদের। আর ধরুন, সত্যি কথা বলতে গেলে, আপনারা অর্থাৎ ফটোগ্রাফারেরা যা করেন, তার মধ্যে আর্ট বলে জিনিষের বালাই নেই। ভাল ক্যামেরা, ভাল ফটো —বাস্, আপনাদের কাজ হলো যন্ত্রের কাজ। তবু আপনার দক্ষিণা…।

বিজয় গুপ্তের সারা মুখে একটা রক্তাভ উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সে সব সহ্য করতে পারে কিন্তু ফটোগ্রাফীর নিন্দা বরদাস্ত করা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বিজয় গুপ্তকে তাঁর ফটোগ্রাফার গুরু শিখিয়ে দিয়েছেন—ফটোগ্রাফী যন্ত্রের খেলা নয়, ফটোশিল্পীরাও শিল্পী, বরং তারাই নতুন যুগের শিল্পী। গুরুদত্ত সেই বাণীকে সম্পাদক অক্ষয় বাবু নিন্দে করে ভয়ানক ভুল করছেন। ফটোগ্রাফীর নিন্দা—এখানে কারও কাছে হার মেনে কোন আপোষ করতে রাজী নয় বিজয় গুপ্ত। নেহাৎ সহ্য করতে না পেরেই বিজয় গুপ্ত বললো।—কথাগুলি সংযত করুন অক্ষয় বাবু।

অক্ষয় বাবু।—বেশ বেশ, মাপ করবেন। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম আর্টিষ্ট যেমন কল্পনাকে রূপ দিতে পারে…

বিজয় গুপ্ত।—ফটোশিল্পী বাস্তবের রূপ ধরে দিতে পারে।

অক্ষয় বাবু।—আর্টিষ্টের তুলিতে যেন একটা অতীন্দ্রিয় রোমান্স আছে।

বিজয় গুপ্ত।—ক্যামেরার সেলুলয়েডের চোখে সত্যের রোমান্স আছে।

অক্ষয় বাবু।—আর্টিষ্টরা ...

বিজয় গুপ্ত বাধা দিয়ে বললো।—আর্টিষ্টরা বস্তুর ওপর মিথ্যার রূপ দেয়। ওটা রঙের ছলনা।

অক্ষয় বাবু।—তাহলে ফটোগ্রাফারেরা ...।

বিজয় গুপ্ত।—ফটোগ্রাফারেরা মিথ্যার আবরণ সরিয়ে দিয়ে বস্তুর রূপ খুলে দেয়।

অক্ষয় বাবু আবেগভরে বলে উঠলেন।—আশ্চর্য্য, আপনি আমাকে আশ্চর্য্য করে দিলেন বিজয় বাবু। এভাবে আমি কোনদিন ভেবে দেখিনি। আপনার কথায় বুঝলাম সত্যিই আপনারা—কী বলবো! আপনারা হলেন—আর্টিষ্টরূপী শশক-জম্বুক সঙ্কুলিত মানব অরণ্যের শিল্পীকেশরী।

বিজয় গুপ্ত শান্ত হয়ে বললো।—আজকের মত উঠি।

সিগারেটের ডিবেটা এগিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে সম্পাদক অক্ষয় বাবু বললেন।—আসুন। সেই প্রতিযোগিতার কথা স্মরণে রেখেছেন তো? উঠে পড়ে লাগুন এইবার, আর যে সময় নেই।

চলে আসবার আগে বিজয় গুপ্ত উৎসাহিত ভাবেই উত্তর দিল।—নিশ্চয় মনে আছে। আসি। নমস্কার।

কোনো একটি দেশকল্যাণ সমিতি থেকে একটী প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে আর্টিষ্ট এবং ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে।—"অনশন ও বুভুক্ষার ফলে মানবতার চরম ক্ষতি কি হইতে পারে, এই বিষয়ে যে শিল্পীর

অঙ্কিত চিত্র অথবা তোলা ফটো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে, সেই শিল্পীকে মাতৃমঙ্গল সমিতি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবেন।"

স্বাক্ষর পত্রিকার তরফে সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী অক্ষয় বাবু অতিরিক্ত আরও একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। প্রতিযোগী শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং তোলা ফটো—সবই আগামী সংখ্যা স্বাক্ষরের কলেবর অলঙ্কৃত করে প্রকাশিত হবে।

আর্টিষ্ট বনাম ফটোগ্রাফার—প্রতিযোগিতাই শেষাশেষি একটা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মত হয়ে দাঁড়ালো। বহু আর্টিষ্ট যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সব চেয়ে বড় ভরসা শ্রীমন্ত সেন। শ্রীমন্তের হাতের তুলি দুর্ব্বল নয়, তার কল্পনা অনুজ্জ্বল নয়। তার রঙে কত ব্যঞ্জনা, রেখায় কত দ্যোতনা ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীমন্ত আর্টিষ্ট চুপ করে বসে নেই। তার সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে সংহত করে ষ্টুডিওর নিরালায় বসে এক রকম ধ্যানস্থ হয়ে আছে শ্রীমন্ত। রাত জাগতে হচ্ছে—স্নানাহার করতে ভুলে যাচ্ছে। আর্টিষ্ট সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব শ্রীমন্ত সেনের ওপর পড়েছে।

ফটোগ্রাফারেরাও কম উতলা হয়নি। ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গেছে তারা। নিজের নিজের জয় পরাজয়ের কথা তারা ভাবে না। তারা শুধু কায়মনে প্রার্থনা করে ফটোগ্রাফার সম্প্রদায়ের জয় হোক্। অর্থাৎ বিজয় গুপ্তের জয় হোক্। বিজয় গুপ্তকে তারা শতভাবে প্রেরণা দিয়ে বলেছে—আমাদের মান সম্মান আপনার হাতে বিজয় বাবু। জলছবিওয়ালাদের কাছে যদি হেরে যাই, তবে এ জীবনে ক্যামেরা আর স্পর্শ করবো না!

বিজয়কে তারা রোজই দেখছে। সকাল হতেই কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে পথে বের হয়ে পড়ে বিজয় গুপ্ত। কোন ত্রুটী করছে না সে। খোলা আকাশ, প্রভাতের সূর্য্যালোক, সন্ধ্যার রক্তিম মেঘ, কলকাতার উত্তপ্ত পথের রৌদ্রজ্বালা—এই তার ষ্টুডিও। ফুটপাতে, গাছতলায়, বস্তির

অন্তরে—পথে প্রান্তরে মানবতার সেই চরম ক্ষতির দুর্লক্ষ্য চিহ্ন আবিষ্কারের যাত্রায় বের হয়েছে বিজয় গুপ্ত। ক্ষান্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

স্বাক্ষর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। একটা তীব্র ঔৎসুক্যের স্পন্দন শত শত গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহীর মনের অনুভব ছেয়ে রেখেছে ঠিক এই মুহূর্ত্তটীতে। সদ্য প্রকাশিত স্বাক্ষরের পাতা উল্টিয়ে দেখছেন সমালোচকেরা। গ্রাহকেরা দেখছেন সাগ্রহে। মেসে বোর্ডিংয়ে ছাত্র হোটেলে লাইব্রেরীতে কৌতূহলী পাঠকের মাথার ভীড় স্বাক্ষর পত্রিকার ওপর ঠোকাঠুকি করছে। পরীক্ষকেরা প্রতিযোগী শিল্পীদের নামের তালিকা হাতে নিয়ে নম্বর দিচ্ছেন একে একে—ঠিক এই মুহূর্ত্তটীতে।

প্রথম পৃষ্ঠা খুলতেই দর্শকের চোখের ওপর একটা বিচিত্র বর্ণরাগের আলিম্পন ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবি। দর্শকদের মনের গহন থেকে আপনা-আপনি একটা করুণতম আক্ষেপধ্বনি উৎসারিত হয়—আহা! যাঁরা একটু আবেগ প্রবণ তাঁদের চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। কী করুণ এই ছবি!

—পথের পাশে একটী গাছের ছায়ায় এক ক্ষুধাজীর্ণ ভিখারিণী বসে আছে। তার কোলে একটী মুমূর্ষু শিশু। শিশুটীর অন্তিম মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এসেছে। অস্থিসার ভিখারিণী মাতার বুকে শিশুপ্রাণের পানীয় সেই জীবতুষ্টির ধারা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুমূর্ষু শিশুর তৃষ্ণার্ত্ত অধর শুধু শেষ বিদায়ের আক্ষেপে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। আর ভিখারী মাতার চোখ থেকে একটী দুটী করে তপ্ত মুক্তার মত জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে শিশুটীর অধরে।

ব্যর্থ মাতৃত্বের একটী সুকরুণ দৃশ্য। সার্থক ছবি। কোন সন্দেহ থাকে না, আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের জন্যই জয়মাল্যের পুরস্কার অবধারিত।

পরীক্ষকেরা পাতা উল্টিয়ে যান। পর পর কত ছবি, কত ফটো বিচিত্র পটক্ষেপের মত পাঠক ও দর্শকের চোখের ওপর দিয়ে চকিতে পার হয়ে যায়। কোন ছবি, কোন ফটো মনে ধরে না পরীক্ষকদের। শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবির তুলনায় সবই নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শেষ পৃষ্ঠায় পৌছে পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণের জন্ম স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তের তোলা ফটো। শুধু পরীক্ষকেরা নয়, ঠিক এই মুহূর্ত্তটীতে গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহীর দল ঠিক এমনি ভাবে ফটোর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে। যুগ যুগান্তের প্রত্যয়ে লালিত একটা মোহ রূঢ় আঘাতে যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। রূপকথা নয়, কল্পনা নয়, কিম্বদন্তী নয়, কলকাতার পথের ওপর কুড়িয়ে পাওয়া একটী নিরলঙ্কার ছবি।

—এক শিশুসেবা প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের সামনে গাছের তলায় এক ভিখারী মাতা বসে আছে। তার কোলের ওপর মুমূর্ষু শিশু সন্তান। শিশুটীর বুকের পাঁজরা থরথর্ করে কাঁপছে, বিস্ফারিত ঠোঁট-দুটীতে বিদায়ী প্রাণ বায়ুর শেষ সাড়া ফুটে উঠেছে। আর ভিখারিণী মাতা পরম প্রসন্ন মনে এক মগ-ভর্ত্তি দুধ ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে চলেছে।

শোকাহতের মত পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। লুপ্ত মাতৃত্বের একটী নিষ্ঠুর ছবি। মানবতার চরম ক্ষতি। শ্রেষ্ঠ ছবি।

পরীক্ষকেরা নম্বর দিলেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত। পুরস্কার ঘোষনা করলেন পরীক্ষকেরা।

ঠিক এই মুহূর্ত্তটীতে আর্টিষ্ট শ্রীমন্ত সেন স্বাক্ষর পত্রিকাটীকে বন্ধ করে তুলে রাখলো। একটা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর যেন হঠাৎ সে জেগে উঠেছে। রঙের তুলিগুলি একে একে ধুয়ে দেরাজে বন্ধ করলো। তারপর কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখলো।—আমার অভিনন্দন জানবেন বিজয় বাবু।

কাঞ্চনসংসর্গাৎ

অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী লিখবে কান্তিকুমার!

রামগড়ের যাদের বয়স আজ ত্রিশ বছরের কম নয়, তারা প্রত্যেকেই অটলবাবুর সাবেকী চেহারাটা স্মরণ করতে পারে। বাঙালীর মতই ধুতি আর কোট পরতেন, কিন্তু মাথায় ছিল প্রকাণ্ড একটা পাগড়ী আর বগলে একটা তালিমারা ছাতা। মাসের পঁচিশটা দিন কেটে যেতে কোন জংলী পরগণার ডিহিতে—কোন মাহাতোর বাড়ীতে খড়ের মাচানের ওপরে শুয়ে—ছাতু খেয়ে। দু'পয়সা কমিশনের লোভে গিরমিটিয়া কুলি রিক্রুট করে ফিরতেন অটলবাবু। শেষে বাড়ী আসাই প্রায় ছেড়ে দিলেন।

অটলবাবুর স্ত্রী মণিমালা বলেছিলেন!—ছেড়ে দাও এ কাজ। দিন একরকম চলেই যাচ্ছে। ঘরে থেকে যদি পার, কিছু রোজগার কর; না পার দুঃখ নেই—আমি একরকম করে চালিয়ে নেবই।

অটলবাবু বলতেন।—মানুষের পিঞ্জরা পোল নেই মণি। বুড়ো বয়সে

যাতে উপোষ করে না মরতে হয়, সেই ভাবনাই ভাবছি। কুকুর বেড়ালেরও একরকম চলেই যায়। চলে যাওয়াটা কোন কথা নয়; কথা হচ্ছে ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমাতেই হবে।

গোঁসাইপাড়ার শেষপ্রান্তে দুটি ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে চার টাকা ভাড়ার একটা মেটে বাড়ীতে মণিমালা থাকতেন। মেয়ে স্কুলে দিদি-দিদিমণির কাজটা পেয়েছিলেন, তাই পনরটা টাকা মাসে মাসে আসতো। নিজের হাতে মাটি কুপিয়ে উঠোনে লাউ কুমড়ো ফলাতেন মণিমালা। সব্জীওয়ালা ডেকে দরদস্তুর করে নিজেই বেচতেন। তাঁর হাতের কাঁটা কুরুষ কখনো থামতো না। রান্নাঘরেই হোক বা বিছানায় বসেই হোক, মাঝরাত্রি পর্য্যন্ত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে লেস বুনতেন। পূজোর সময় নতুন পোষাক তৈরীর মরসুম লাগতো ঘরে ঘরে—মণিমালার এই পরিশ্রমের পণ্য বিকিয়ে যেত সবই।

এইভাবেই বছরের পর বছর পার হলো। জনা ও প্রীতি—দুটি মেয়েই বড় হলো। দুজনেরই বিয়ে দিলেন মণিমালা। গরীব গেরস্থ ঘরের দুটি ভাল ছেলেকেই পাত্র পেয়েছিলেন। বিয়ের খরচ যোগাতে দেনা করতে হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, নিত্য অনটনের পূর্ণগ্রাস থেকে যেন একটু একটু করে চাঁদির কণিকা বাঁচিয়ে সেই দেনাও তিনি শোধ করে দিলেন। তিনি কারও ধার ধারেননি।

মেয়েদের বিয়ের সময় অটলবাবু তবু দুটো দিন উঁকি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মণিমালার অসুখের খবর পেয়েও সহসা চলে আসতে পারলেন না। রোগটাও খারাপ ছিল। ডাক্তারেরা বললেন—হয় এনিমিয়া, নয় টি-বি। তা' না হলে বোধ হয় হলদে জ্বর—ভারতবর্ষের এই ফার্ষ্ট কেস। কাজেই কিভাবে যে ট্রীটমেন্ট হবে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মোট কথা রামগড়ের সকলেই বুঝতে পারলেন, বিশ বছরের কাজের

খাঁচায় পোষা একটি ঠুনকো বাঙালী নারীর প্রাণ এইবার ভেঙে পড়ছে।

অনেক খোঁজ তল্লাসী করে অটলনাথের হদিস পাওয়া গেল। অনেক অনুরোধ করে তাঁকে বাড়ী ফেরানো হলো। প্রতিবেশী কীর্ত্তিবাসবাবুকে এর জন্য অফিস কামাই করতে হলো চারটে দিন। তিনি এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে শিকারী কুকুরের মত ঘুরেছেন—শুধু অটলনাথকে পাকড়াও করতে।

গোসাইপাড়ার প্রতিবেশীরা একটু বেশী রাগ করেছিল, মণিমালার অন্তিম অভিমান হয়তো একটু বেশী করে মনে বেজেছিল—কিন্তু ভুল হচ্ছিল সবারই। জীবনে যে মানুষ অন্ততঃ হাজারটি গেরস্থকে গিরিমিটিয়া করে ছেড়েছে, সে-মানুষের মনে ঘরের ধর্ম্ম যে কবেই মিথ্যে হয়ে গেছে তা সে নিজেই জানে না, পরের ধারণাতেও আসে না। কত ঘরের পুরুষকে ঘরছাড়া করেছে দালাল অটলনাথ—ফিজির রবার গাছের গোড়ায় পচে সার হয়ে গেছে তারা। কত ঘরের শুধু ভিটে পড়ে আছে; কত ঘরের মেয়ে জাতের বার হয়েছে। কত শিশু ভিখিরি হয়েছে। দালালির কমিশনে থলি ভরে উঠেছে অটলনাথের। মণিমালা মরবেন, অটলনাথের ঘরের প্রদীপটা নিভে যাবে; এর মধ্যেও আজ বিচলিত হবার মত কোন আঘাত পায় না অটলনাথ।

প্রতিবেশীরা একের পর এক এসে অটলনাথকে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন।—খুব দেখালেন মশাই! এবার যদি ভাল চান তো ও'র সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

জনা আর প্রীতি—মেয়ে দুটো ঠিক এই সন্ধিক্ষণে শ্বশুরবাড়ী থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এসে জুটলো। কান্নাকাটি, ডাক্তার ডাকাডাকি, লম্বাচওড়া ওষুধের প্রেসক্রিপসন, ফুড আর ফলের ফর্দ—চারদিক থেকে একটা দাবীর ঝড় যেন ষড়যন্ত্র করে অটলনাথের টাকার থলিটা লোপাট করার জন্য দাপাদাপি সুরু করলো।

অটলনাথকে বাঁচিয়ে দিল কান্তিকুমার। টাকার থলিটা কান্তিকুমারের কাছে স'পে দিয়ে অটলনাথ প্রায় কেঁদে ফেললেন।—কান্তি, তুমি আমার বন্ধুর ছেলে। এ'সহরে তুমি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার গায়ের রক্ত-জল-করা এই সামান্য পুঁজি। তোমার মণিমাসী তো ফাঁকি দিয়ে আমার আগেই চললেন। শুধু কুটোর মত আমি একাই সংসারে ভেসে রইলাম। নেহাৎ প্রাণের দায়ে না পড়লে এই জঞ্জাল আর তোমার কাছে ফিরে চাইতে আসবো না। ওসব তোমারই হবে। তুমি এটা রেখে দাও তোমার কাছে।

মণিমালা বেশী দেরী করেননি। সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেলেন। অটলনাথের থলিভরা ভবিষ্যৎ অটুট হয়ে কান্তিকুমারের কাছেই রইল। এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী।

রামগড়ের বাতাসে একটা গোপন খবর ফিসফিস করে—কান্তিকুমার আর জয়া, জয়া আর কান্তিকুমার।

প্রতাপবাবুর মত একটি পিতৃদেব ছাড়া আপন বলতে জয়ার আর কেউ নেই। আজ ওর বয়স সাতাশ বছর। আপন করে নেবার মত কোন নতুনজনের ডাক আজও আসেনি, জীবনে আর আসবে কি না কে জানে। দেখতে সুন্দর হলেও, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অভিমানে সেই স্তোকনম্র তারুণ্য যেন বয়সের ভারে এক কমনীয় আলস্যে আরও ভারী হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সময় এসে পড়লে মধুবল্লীও কাঁটাগাছ জড়িয়ে ধরে। যার সময় পার হতে চলেছে, তার কাছে কান্তিকুমার সোনার তরুণার চেয়েও বেশী বৈকি। এত ভাল ছেলে কান্তিকুমার।

জয়ার বাবা প্রতাপবাবু বলতে গেলে কিছুই রোজগার করেন না, অথচ চলে যায় বেশ। কান্তিকুমার প্রতাপবাবুর কেউ নয়; দু'বেলা ছেলে পড়িয়ে, আট ঘণ্টা [illegible] অটোমোবিল স্টোরে কলম পিষে,

কান্তিকুমার যা রোজগার করে, তার উত্তমাংশ সবই প্রতাপ বাবুর সংসারের শত রকম দাবীর যোগান দিতেই ফুরিয়ে যায়। কৃচ্ছ্র উপার্জনের মাত্রা এতটা টান সইতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে ধার করতে হয় কান্তি-কুমারকে। ধার শোধের সংস্থান করতে গিয়ে হয়তো তৃতীয় একটা ধুতি কেনা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়। বর্ষার মেঘের মতই কান্তি-কুমারের মনটা; পরের জন্য সমবেদনায় গলে পড়েছে—নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে।

প্রতাপ বাবুর নাকি এককালে খুব ভাল অবস্থা ছিল। প্রবাদ আছে—সোনার ছিপে মাছ ধরতেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। ছিপটা বাঁশেরই ছিল, হুইলটা ছিল সোনার তৈরী এখন অবশ্য মাঝে মাঝে মুনসেফ আদালতের বারান্দার এক কোণে দোয়াত কলম নিয়ে বসেন। দু'-একটা দরখাস্ত লেখার কাজ পেয়ে যান। আট দশ আনা যা চলে আসে তাই লাভ।

এক একদিন ধারের ফিকিরে বার হয়ে হয়তো অনেক রাত্রে ঘরে ফেরেন প্রতাপ বাবু। জয়া জেগে বসে থাকে। খেতে বসে গম্ভীর হয়ে বলেন।—কীর্ত্তিবাস আজ আমায় অপমান করেছে জয়া।

জয়া।—কেন?

—কিছুই কারণ নেই। গায়ে পড়ে উপদেশ দিল, কান্তির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার জন্য।

জয়া চুপ করে থাকে। কীর্ত্তিবাসবাবুর উপদেশের মধ্যে অপমানের প্রমাণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করে, মনে মনে হেসে ফেলে।

প্রতাপবাবু নিজের মনেই বলে যান। —কান্তি ছেলেটির হৃদয় খুব মহৎ সন্দেহ নেই। নিজে দারুণ অভাবে থেকেও দরকারের সময় চাইতেই দু'চার টাকা ধার দিয়ে দেয়। তবে সবই তো শোধ করে দেব একদিন।

তাই বলে ওর সঙ্গে প্রতাপ রায়ের মেয়ের বিয়ে? কী যে বলে! কীর্ত্তিবাসটা একটা ষ্টুপিড।

খাওয়া শেষ হলে, হাত মুখ ধুয়ে, পান চিবিয়ে একটা ছেঁড়া কৌচের ওপর নতুন আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বসে থাকেন প্রতাপবাবু। সিগারেটের নতুন টিনটা খোলেন। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে আর একটা মিঠে-পচা গন্ধ থেকে ঘরের বাতাস ভুরভুর করে ওঠে। জয়া বুঝতে পারে, প্রতাপবাবু আজ মদ খেয়েছেন। ঐ নতুন আলোয়ান আর একটিন সিগারেট আজই কেনা হয়েছে। আজই সকালে কান্তির কাছে কুড়িটা টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছেন প্রতাপবাবু। জয়া সব খবর রাখে।

পরের দিন জয়ার সঙ্গে কান্তির একবার দেখা হয়। প্রতাপবাবু বাড়ীতে নেই। জয়া হেসে হেসে বলে।—কান্তিদা তুমি শীগগির বড়লোক হও। নইলে শেষে বড় অপমানের ব্যাপার হবে।

—কেন বলতো?

—বাবাকে তুমি এতদিন ভুল বুঝেছ, আমিও ভুল বুঝেছি। তিনি শুধু তোমার টাকা ধার নিচ্ছেন, শোধও করে দেবেন একদিন। আর কোন ভাবে তোমাকে আমল দিতে বাবা রাজি নয়।

হঠাৎ জয়ার চোখ ফেটে জল দেখা দেয়। তবু দায়ে পড়ে আজ ওকে শক্ত হতে হয়। অভিমানিনী নায়িকার মত চুপ করে থাকার উপায় ওর নেই। তাই জয়াকে বলতে হলো।—তুমি আমাকে চারিদিকের এই দুর্নামের ঘেন্না থেকে বাঁচাও কান্তিদা। তুমি নিজে বড় হও, অবস্থা ভাল করে নাও। যারা আজ তোমাকে আড়ালে বদমাস বলে গালি দিয়ে বেড়ায়, তখন তারাই তোমাকে প্রেমিক বলে বাখান করবে।

যেন কৌতুক করার জন্যই মুখে হাসি টেনে কান্তিকুমার বললো।—

আমার কাছে নগদ দশটি হাজার টাকা আছে, তোমার বাবা সে-খবর জানেন ?

জয়া।—আমার জন্য বলবার কেউ নেই, তাই প্রাণের দায়ে বেহায়ার মত তোমাকে নিজের মুখে সব বলতে হচ্ছে। এর ওপর তুমি আর বৃথা ঠাট্টা অপমান করো না।

—বিশ্বাস কর জয়া। প্রীতির বাবা অটলবাবু টাকাটা আমার কাছে জমা রেখে গেছেন। আবার চাইতে এলে ফেরত দিতে হবে।

দৃষ্টিটা আরও গভীর করে নিয়ে কান্তিকুমারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, দুর্মদ একটা আগ্রহে জয়া হঠাৎ অনুরোধ করে বসলো—ফেরত দিওনা কান্তিদা।

—ছিঃ, ওকথা বলো না।

—পরে না হয় শোধ করে দিও, এখন টাকাটা দিয়ে একটা কারবার সুরু করে দাও কান্তিদা।

—সেটাও অন্যায় হবে। কারবার যদি ফেল পড়ে, তখন পাপের ভাগী হবে কে ?

—আমি হব। আমার জন্য তুমি এইটুকু সাহস কর কান্তিদা।

—থাম জয়া। সৎপথে থেকে কি টাকা রোজগার হয় না ?

—সৎপথে থেকে তো শুধু দুর্নাম রোজগার করছো আর দিন দিন রোগা হচ্ছো। অটলবাবুর মত নরপিশাচের টাকা—তুলে নিয়ে দামোদরের জলে ফেলে দিলেও পুণ্যি হবে।

—এত ঘাবড়ে গেলে কেন জয়া ? আমাদের ভালবাসা ঠিক থাকলে কেউ আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবে না। ধৈর্য্য হারিও না। তোমার বাবারও মন বদলাতে কতক্ষণ ?

জয়ার মুখ আবার করুণ হয়ে উঠলো।—তুমি আমার দুঃখ বুঝতে

পারলে না কান্তিদা। বড় বেশী ভালমানুষ তুমি। ধৈর্য্য, সৎপথ, ভালবাসা ঠিক রাখতে হবে, বাবার মন বদলাবে—এতগুলি ছুতো মানতে গিয়েই তোমায় দফা শেষ হবে, দিন ফুরিয়ে যাবে। তারপর……তারপর আর কোন কিছুর মানে হয় না।

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে গেল জয়া। জয়ার মন থেকে এই অলীক দুশ্চিন্তা আর সংশয়ের স্পর্শটুকু মুছে দেবার জন্য দুটো বেশী কথা বলে সান্ত্বনা দেবার সময়ও আর ছিল না। এখনি আবার কাজে যেতে হবে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার।

এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথের জীবনী।

অটলবাবু বললেন।—কণ্ট্রাক্টটা পাওয়া গেলে সেটা তোমারও একরকম পাওয়া হলো কান্তি। যদি একটু খেটেখুটে দাও, তবে তোমারও কিছু লাভের পাওনা হবে নিশ্চয়। যে ভাবেই হোক, গুপ্ত ব্রাদার্স'কে পথ থেকে সরাতে হবে; ওদের সঙ্গে রেট নিয়ে কম্পিটিসনে এঁটে ওঠা মুস্কিল। আজ কালের মধ্যেই ওরা টেণ্ডর দাখিল করে দেবে। তার আগে একটা ব্যবস্থা করতেই হয় কান্তি।

বিরক্তি চাপতে গিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলো কান্তিকুমার।—লোভ দেখাবেন না অটলবাবু। আপনার সঙ্গে কারবার করে বড় মানুষ হবার কোন মোহ নেই আমার।

মুহূর্তের মধ্যে নিজের হঠকারিতার নিদারুণ ভুলটুকু বুঝতে পেরে যেন অটলবাবুর কথাগুলি অনুতাপে পুড়তে লাগলো।—সত্যি, বড় লজ্জা দিলে কান্তি। এই অধম কুলি বুড়োর ভাষাটা মাপ করো, কিছু মনে করো না। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে; তোমার কাছে যদি একটু উপকার আশা না করি, তবে আর কার কাছে …।

প্রত্যুত্তরে কান্তিকুমারের কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে পড়লো।—উপকারের কথা যদি বলেন, তবে অবশ্য আমি প্রতিবাদ করতে চাই না। কিন্তু আমার এমন কী সামর্থ্য আছে যে...।

অটলনাথ।—আছে আছে, একমাত্র তোমারই সামর্থ্য আছে কান্তি। তোমার মত চরিত্র আর বিদ্যেবুদ্ধি—যা ছোঁবে তাই সোনা হয়ে যাবে। নইলে আমার মত গবেটের কী সাধ্য আছে যে বিজিনেস্ করতে পারি? না কান্তি, আমাকে এই উপকারটুকু তোমার করতেই হবে।

কান্তিকুমার চুপ করেছিল। ভদ্রলোকের ছেলে কান্তিকুমার, মনের মাটীটা তাই খুব নরম। সামান্য বর্ষাতেই ভিজে কাদা হয়ে যায়। অটলনাথের আবেদনটাও এইবার তাই ঠিক জায়গা বুঝে আঝোরে ঝরে পড়লো।—এটা আমার বুড়ো বয়সের একটা সখ, একটা ব্যামো মাত্র কান্তি—কারবার করবো। তুমি শুধু আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে একটু পথ দেখিয়ে দেবে, শুধু দুটো পরামর্শ, এক-আধটা পলিসি, একটুখানি প্যাঁচ, আর একটু...।

একটা প্রসন্নতার উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে হেসে ফেললো কান্তিকুমার। অটলনাথ বললেন।—এর জন্য তোমাকে কোন দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করার দুঃসাহস আমার নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কোন দিন তোমাকে সম্মানী হিসাবে কিছু দিতে যাই, হাত তুলে তোমাকে নিতেই হবে কান্তি। জেনে সেটা আমার আশীর্বাদ, আমার দেওয়া উপহার মাত্র। যদি সর্বস্ব দিয়ে ফেলি, তা'ও তোমায় নিতে হবে। প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না কান্তি, তুমি আমার বন্ধুর ছেলে।

কান্তিকুমার বললো।—আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন?

কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা আশ্বাসের স্নিগ্ধতা ছিল।

আশ্বাসটা সর্ব্বসংশয়ের কুহেলিকা ঘুচিয়ে প্রখর ভাবে জ্বলে উঠলো

ক'টা মাসের মধ্যেই। কণ্ট্রাক্টর অটলনাথ ছোট একটা অফিস খুলেছেন। একটা দারোয়ান আছে। আর আছে কান্তিকুমার। কান্তিকুমার শুধু পাপকে ঘৃণা করে, পাপীকে ঘৃণা করে না। উপকারের সুগ্রীব কান্তি-কুমার সহায় হয়েছে অটলনাথের।

সূর্য্যপুরা থেকে চৌধুরীঘাট—নতুন সড়ক তৈরীর কণ্ট্রাক্ট। কম করে ত্রিশটি হাজার টাকা মুনাফা থাকবেই।

অটলনাথ বললেন।—ওয়ার্কস অফিসের হেড কেরাণীটিকে আগে বাগাতে হবে।' কান্তিকুমার এক সন্ধ্যায় হেড কেরাণীকে ঘুস পৌঁছে দিয়ে এল—সাতশো টাকার নোটের একটি তাড়া।

অটলনাথ বললেন।—গুপ্ত ব্রাদার্সের মেজ গুপ্তকে বিগড়ে দিতে হবে।' কান্তিকুমার দুবোতল হুইস্কি নিয়ে মেজ গুপ্তকে নয়াবাজারের গলিতে একটা ঘর চিনিয়ে দিয়ে এল।

অটলনাথ হঠাৎ অফিস ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে সভয়ে তাকিয়ে, পরমুহূর্ত্তে পাশের ঘরে লুকিয়ে পড়েন। পাওনাদার আসছে। কান্তিকুমার নীলকণ্ঠের মত পাওনাদারের যত কটূক্তি আর অপমানের বিষ হজম করে। নিঃসঙ্কোচে বলে দেয়—অটলবাবু নেই, কলকাতা গেছেন।

এইসব দুষ্কৃতির কলুষ কান্তিকুমারকে স্পর্শ করতে পারে না। সে যেন তার বিবেককে আলগোছে সরিয়ে রাখতে পারে। কান্তিকুমার জানে এই কারবারের অধিকর্ত্তা অটলনাথ, সে নিজে উপদেষ্টা মাত্র। অটলনাথের কারবারী অভিযানের সকল কূটকীর্ত্তির দূত মাত্র কান্তিকুমার। শুধু দৌত্যের সম্মানীটুকুই তার প্রাপ্য এবং তাতেই সে তৃপ্ত। এর ওপর তার কোন দাবী নেই। বিবেকে বাধে।

কিন্তু অটলনাথ প্রতি মাসে কান্তিকুমারকে অতি নিয়মিত ভাবে পনরটা করে টাকা সম্মানী দিতে ভুল করেন না। এই সম্মানীটা কিন্তু

মজুরীর চেয়ে নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট। একটা থট্‌কা লাগে মনে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে কান্তিকুমারের নীতিদিগ্ধ মনের সব সংশয়ের ভার একটী যুক্তির আঘাতে লঘু হয়ে যায়—হলোই বা মজুরী। চাকরী বললেও ক্ষতি কি? যে মাঝি ডাকাতকে খেয়া পার করে দেয়, তার কি দোষ? মাঝি শুধু খাটুনির মজুরী পায়, লুঠের ভাগ পায় না।

প্রতাপ বাবু নামছেন, আর অটলনাথ উঠছেন। এ দুয়ের মাঝখানে শুদ্ধাচলে স্থির হয়ে আছে একটি ভদ্রলোকের এক কথার মূর্ত্তি—কান্তিকুমার।

এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী।

জয়া বললো।—প্রীতির বাবার কারবারে তুমি নাকি চাকরী করছো?

কান্তি।—হাঁ, ওখানে চাকরী করাই ভাল। যাসব কেলেঙ্কারী আরম্ভ করেছে অটলবাবু ওর মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না।

জয়া।—আশ্চর্য্য করলে তুমি। চাকরী করলেই কি জড়ানো হলো না?

—না, আমি তো কারবারের ভাগীদার নই। কাজেই পাপের ভাগী-দারও হব না। তা ছাড়া, কখন হাতকড়া পরবার ডাক এসে যাবে কে জানে? তার ভাগীদারও আমি হতে চাই না।

—আমি যদি আজ কান্তি হতাম, তা হলে অটলনাথকে ডুবিয়ে দিয়ে—কারবারটা নিজে বাগিয়ে নিতাম। আমার কাছে সেটাই একমাত্র পুণ্য কাজ মনে হতো।

জয়ার মুখের ভাব কঠোর হয়ে উঠলো। কান্তির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জয়ার চোখ দুটো এক অসহ ক্ষোভের জ্বালায় ফুটতে লাগলো।—আচ্ছা, অটল বুড়োকে ঠকাতে না পার, আর এক বুড়োকে পারবে?

—কাকে ?

—আমার বাবাকে।

—সে কি কথা ? তোমার বাবাকে ঠকাবো কেন ?

—হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে চল। আমি এখানে আর থাকতে চাই না। চল কাউকে না বলেই আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

মরমে মরে গিয়ে যেন কান্তিকুমার বললো।—নিজেকে এত ছোট করে ফেলছো কেন জয়া ? ভুল করো না। অধীর হওয়াটাই ভালবাসার প্রমাণ নয়। প্রতীক্ষার শক্তিতেই ভালবাসা বড় হয়। তুমি আমার কথাটা একবার ভেবে দেখছো না ? দেখছো না, কত দুঃখ দুর্নাম পরিশ্রম বরণ করে, দিনের পর দিন শুধু তোমারই জন্য……।

—দোহাই তোমার, একবারটি তুমি পুরুষের মত আমার কাছে এস। আমাকে নিয়ে চল। তোমার দুঃখ পরিশ্রমের সার্টিফিকেট আমি খুঁজছি না, আমি তোমাকেই খুঁজছি। আমাকে আর অপমান করো না কান্তিদা।

—একটু ধৈর্য্য ধর জয়া।

ঘন সীসু গাছের আড়ালে অটলনাথ বসু চৌধুরীর বাড়ীটাকে দূর থেকে কোন বাদশাহী মহল বলে মনে হয়। শুধু ফটকের থামে লেখা মরকত-কুঞ্জ' নামটাই সে-ভুল ভাঙিয়ে দেয়। আজকের কুলিরাও কত অল্পদিনের মধ্যে সেই ছাতুখেকো অটলনাথকে ভুলে গেছে, নইলে মরকত-কুঞ্জকে তারা কখনই 'রাজাবাবুর বাড়ী' বলতো না। এই বৈভবের ছবি মণি-মালার স্বপনের দুরাশায় কখনো উঁকি দেয়নি। মণিমালা ফুরিয়ে গেছেন অনেকদিন ; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সে-সংসারের দুঃখী নটে গাছটিও কবে মুড়ে গেছে। এখন আরম্ভ হয়েছে একেবারে নতুন করে। হলঘরে গজদন্তের

ফ্রেমে বাঁধানো অয়েল পেন্টিংয়ের মণিমালা নিষ্পলক চোখে এই কাঞ্চন-পুরীর সীমাহীন প্রাচুর্য্যের দিকে তাকিয়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছেন।

লোকে কতভাবে জল্পনা-কল্পনা করেছে, কিন্তু আজও কেউ কিছু ঠাউরে উঠতে পারে না—কী করে অটলবাবু হঠাৎ এত ফেঁপে উঠলেন? কাঠুরিয়ার মাণিক কুড়িয়ে পাওয়ার গল্পকেও বিস্ময়ে ছাপিয়ে উঠেছে। শতবাহু বিস্তার করে এগিয়ে চলেছে অটলবাবুর প্রতিভা। মানসম্পদের আকাশে যতগুলি চাঁদ-সুরুজ-তারা আছে সবই যেন তিনি লুফে নেবেন। এরই মধ্যে দশটা জয়েণ্ট ষ্টক কারবারের ম্যানেজিং এজেন্সীর টুপি তাঁরই মাথায় এসে ভীড় করেছে—আরও আসছে। গালা রেশম অভ্র চা আর টিম্বার—এই ছয়টি পণ্যের ছয়টি রপ্তানী কারবারের ষোল আনা মালিকানা অটলবাবুকে প্রায় চাঁদসদাগর করে ফেলেছে। অটলনাথ স্বয়ং একটী রাষ্ট্র—এক হাজার কুলি কেরাণী ও কারিগরের অন্নের আশ্রয়।

শিবাজী-উৎসবে এক হাজার লোকের সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক জনহিতৈষী অটলনাথ বক্তৃতা করতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন না। বাণিজ্যে বসতে মুক্তি! দেশবাসীর কাছে আমার এই একমাত্র বাণী। মহারাজা শিবাজীর আদর্শকে যদি আজ সার্থক করতে চাই, তবে বাণিজ্যের গেরুয়া ঝাণ্ডা আবার তুলে ধরতে হবে। জয়তু শিবাজী।'

করতালির শব্দে সভার উল্লাস চিড়বিড় করে ফুটতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য ঘুম হয় না, এই রকম দুটো খবরের কাগজে একহাত লম্বা শিরোনামা ফলিয়ে অটলনাথের ভাষণ ছাপা হয়।

কান্তিকুমার প্রত্যহ অটলবাবুর লাইব্রেরী ঘরে একবার হাজিরা দিয়ে যায়। অটলবাবুর লাইব্রেরী? কথাটা শুনতে আজ আর কারও কানে খট্‌কা লাগে না। সেদিন আর নেই। অটলবাবু ল্যাটিন ভাষায় কবিতা লিখছেন—একথা বললেও সহসা কেউ অবিশ্বাস করে ফেলতে

পারবে না। ভাগ্যের ছাপ্পর ফুঁড়ে রূপোবৃষ্টি হবার আগে, জীবনের পঁয়তাল্লিশটা বছর যে-মানুষ শুধু কথামালা কাকচরিত্র আর পঞ্জিকা ছাড়া কোন পুঁথির পাতা উল্টে দেখেনি, তাঁরই প্রাসাদের এক প্রশস্ত কক্ষে সারি সারি মেহগনির তাক আর মরক্কো-বাঁধাই বই। একটী জ্ঞানকুসুমের ভরা মালঞ্চ—তারই মালাকর হলেন অটলনাথ।

বাইরের লোকে জানে—কান্তিকুমার হলো অটলনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী। অটলনাথও তাই বলেন। এটা হলো কান্তিকুমারের পোষাকী পরিচয়। ঘরে যখন কেউ থাকে না, শুধু দু'জনে মুখোমুখি বসে—তখন অটলনাথ বেশ সমীহ কোরে, বেশ একটু অন্তরঙ্গতার সুরে সেই আটপৌরে নাম ধরেই ডাকেন। —তা হলে বলতে হয়। কান্তি মাস্টার······।

এই সেক্রেটারীগিরি তথা মাষ্টারীগিরির জন্য মাসিক বিশটী টাকা দক্ষিণা পায় কান্তিকুমার।

সকাল সাড়ে ন'টা থেকে হাজারিমলের অটোমোবিল স্টোরে হিসেব কষে কষে সন্ধ্যে ছটার সময় যখন কান্তিকুমারের মাথার ভেতর পিস্টনগুলি ক্ষয়ে গিয়ে ঝিমঝিম করতে থাকে, ঘাড়ের কাছে স্নায়ুর গিঁটগুলিতে স্পার্কের শক্ লাগে বুকের ভেতর ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে গিয়ে দম ফুরিয়ে আসে—তখন ছুটী হয়। ঘরে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে, দুটো রুটি চিবিয়ে এক গেলাস জল খায়—নিস্তেজ মনুষ্যত্বের ইঞ্জিনটা তখন বোধ হয় একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারপরেই এক অভিনব মাস্টারীর পালা—প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত।

লাইব্রেরী ঘর। টেবিলের মুখোমুখি দু'জনে বসেন। অটলনাথ বললেন—কিছু একটা পড়ে শোনাও দেখি মাস্টার। হাত বাড়িয়ে যে-বইটা পেল এবং খুলতেই যে-পৃষ্ঠা দেখা দিল,—গ্রামোফোনের মত সেখান থেকেই

পড়া সুরু করে দিল কান্তিকুমার।—জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের তুল্য, অতএব......।

পড়া সামান্য অগ্রসর হয়েছে, অটলনাথ মাথা দোলাতে লাগলেন। বোঝা গেল এটা একটা আপত্তির সঙ্কেত।—উঁহু হলো না। এ যে কিছুই বাগিয়ে বলতে পারছে না মাস্টার। গোড়াতেই ভুল করে ফেললো।

কান্তি।—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। এ বইটা রেখে দিই, কি বলেন?

—কী নাম বইটার?

—বিবিধ প্রবন্ধ।

—কে লিখেছে?

—বঙ্কিমচন্দ্র।

—কী আফশোষের কথা! শেষে কিনা বঙ্কিম চাটুয্যে পর্য্যন্ত এই সাদা কথাটা ধরতে পারলে না মাস্টার?

অটলনাথ কাঁচাপাকা রোমশ ভুরু দুটো টান করে সত্যিই আফশোষ করলেন।—না মাস্টার, অন্য একটা ধর। একটু ইতিহাস শোনাও।

কান্তিকুমার ইতিহাসের বই নিয়ে বসলো। পড়া আরম্ভের আগেই অটলনাথ অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেললেন।—বঙ্কিম চাটুয্যে কি রকম টাকা জমিয়ে ছিল, কিছু খবর রাখ মাস্টার?

—বুঝলাম না স্যার।

—ক্যাশ হে ক্যাশ, যাকে বলে নগদ নারায়ণ।

—আজ্ঞে না, সেখবর ঠিক জানি না।

—এগার লক্ষ তেত্রিশ হাজারের বেশী হবে কি?

—এত নগদ টাকা কোথায় পাবেন বঙ্কিম চাটুয্যে?

—তাহলেই বোঝ মাষ্টার! এত বিদ্যেসিদ্যে নামডাক পসার, সব বৃথা হলো না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি এখন বুঝতে পারছো, বিদ্যে জিনিষটা বই ঘেঁটে পাওয়া যায় না? ভগবান যাকে পাইয়ে দেন সেই পায়। কি বল?

—ঠিক কথা। আকবর বাদসাহ ক-খ জানতেন না, কিন্তু এদিকে···।

—ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকলে, ধর আমারই কথা, এতখানি বিদ্যে এমনি এমনি পেতাম কি?

—আপনার কথায় কোন ভুল নেই স্যার।

সত্যি কথা, অটলনাথের কোথাও কোন ভুল হয় নি। গোরক্ষা সমিতি থেকে সুরু করে আদিভারত প্রত্নশালা পর্যন্ত, সর্ব ঘটে তিনি বিরাজ করছেন—কোথাও সদস্যরূপে কোথাও সচিব রূপে এবং কোথাও কোথাও প্রেসিডেন্ট ও পেট্রনরূপে। গত পয়লা বৈশাখেও সুরাপান নিবারণী সভার বার্ষিক বিবরণ তিনিই পড়েছেন।

কিন্তু জয়নগরের ডিষ্টিলারিটার ডাক হবে আসছে মাসেই। বদলী হয়ে নতুন এক আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও এসেছে। অটলনাথ বললেন।—ইতিহাস পড়া এখন রেখে দাও মাষ্টার। আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে একটি জলসা দিতে হবে। বেশ গুছিয়ে একখানা অভিনন্দন লিখে ফেল দেখি।

অটলনাথের বোধ হয় ভুল হচ্ছে, অথবা অন্য কাউকে অভিনন্দন জানাতে চান। আন্দাজে বুঝে নিয়ে কান্তিকুমার তাই বললো।—আবগারী সুপারকে আপনি অভিনন্দন জানাবেন কেন?

—জয়নগর ডিষ্টিলারির ডাক হবে হে মাষ্টার। এই বছরটার জন্য আমিই ডেকে নিতে চাই। এক বছরে কত প্রফিট জান?

—কিন্তু স্যার, লোকে যে আড়ালে নিন্দে ক'রে বলবে—শেষে কিনা অটলনাথের মত জনহিতৈষী মদের ভাঁটির ঠিকে নিল?

—আমার বদলে যদি রায় সাহেব বৃদ্ধিচাঁদ ডিষ্টিলারিটা ডেকে নেয়, তাহলেই বুঝি খুব জনমঙ্গল হবে? বছরে ছিয়াত্তর হাজার টাকার প্রফিট অবাঙালীর হাতে গিয়ে পড়ুক, তোমরা বুঝি তাই দেখে খুসী হও?

অটলনাথ চোখ পাকিয়ে কথাগুলি বললেন। কান্তিকুমারের আর কিছু উত্তর দেবার মত তথ্য ছিল না। অটলনাথের বাণিজ্যসাধনার পুঞ্জ পুঞ্জ মুনাফা বাঙালীর জাতীয় রাজকোষ ফাঁপিয়ে তুলছে, চুপ করে কলমের নিব খুঁটে খুঁটে এই বিশ্বাসটা বোধ হয় খতিয়ে দেখছিল কান্তিকুমার।

ঘড়ির কাঁটার মুখে বর্ষার রাত্রি বারটার দিকে ঠেলে ওঠে। কান্তি হাই তোলে, চোখের পাতা শিথিল হয়ে আসে—পেটের নাড়ীতে ক্ষুধার ইসারা মোচড় দেয়। তবু কান খাড়া করে থাকতে হয়—অটলনাথের কোন প্রশ্নের উত্তর যেন ফসকে না যায়।

অটলনাথ স্মরণ করিয়ে দিলেন।—কই, তুমি কথার কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন?

কান্তি মাষ্টার যেন তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে একেবারে গলে পড়লো।—মাপ করতে আজ্ঞা হয় স্যার। আমি আপনার মত ওভাবে তলিয়ে দেখিনি। তিন বছরের জন্য ডিস্টিলারিটা নিলে হতো না স্যার।

—আপাততঃ, হুঁ। অটলনাথ ঢেঁকুর তুলে থেমে গেলেন।

অটলনাথের মুখের চেহারা থেকে ক্ষণিকের রুষ্ট অন্ধকার আবার ফর্সা হয়ে গেল। কান্তিকুমারও নিশ্চিন্ত হয়ে ছাতাটা তুলে নিয়ে উঠলো।

অটলনাথ বললেন।—আর একটা কথা আছে মাষ্টার। চিঠিপত্রে বিজ্ঞাপনে নোটিশে বা রিপোর্টে, আমার নামটা আর ওভাবে লিখবে না। এবার থেকে নামের আগে 'বাণিজ্যবীর' কথাটা বসিয়ে দেবে। শুধু, বাণিজ্যবীর অটলনাথ, বুঝলে? ভুল হয় না যেন।

—যে আজ্ঞে।

কান্তিকুমার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অটলনাথও উঠে দাঁড়িয়ে আর একটা কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন।—জীবনীটা এইবার লিখতে সুরু করে দাও মাষ্টার। জিনিষটা যেন ভাল হয়, তা হ'লে তোমাকেও খুসী করে দেব। থোক কিছু নিশ্চয় পাবে।

ক'দিন থেকে জয়ার জ্বর হয়েছে। প্রতাপবাবু দিনে দু'বার করে কান্তিকুমারের কাছে টাকার তাগাদায় আসছেন। টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। একদিন দুদিন—তৃতীয় দিন। প্রতাপবাবুকে খালি-হাতে ফিরে আসতে হলো সেদিন। কান্তিকুমারের অর্থের সঙ্গতি একটি চাপেই খতম হয়ে গেছে। ধার করারও আর কোন নতুন আশ্রয় নেই।

জীবনে এই প্রথম কান্তিকুমারের পায়ের তলার মাটি চোরাবালির মত নরম হয়ে গেল। তার সকল আশ্বাস যেন এই একটি ঘটনায় নির্ভর হারিয়ে ফেলেছে। জয়াকে শুধু উপকারের ডোরে বেঁধে রেখেছিল কান্তিকুমার। যদি সেই বাঁধন একবার ছেঁড়ে, তবে ছিঁড়েই গেল বোধ হয়।

জয়ার কাছে মুখ দেখাবে কি করে? এক অমোঘ সুসময়ের প্রতিশ্রুতির বেড়া দিয়ে জয়ার ভালবাসার অধৈর্য্যকে এতদিন স্তব্ধ করে রেখেছে কান্তিকুমার। আজ এসেছে দৈবের উৎপাত। টাকার অভাবে জয়ার চিকিৎসা হবে না। জ্বরের ঘোরে জয়া হেসে উঠবে। তার ভালবাসার মুরোদ ধরা পড়ে যাবে জয়ার কাছে।

টাকা চাই। রাত জেগে অটলনাথের জীবনী লিখছে কান্তিকুমার। অন্তঃসার আর নেই বোধ হয়, মেরুদণ্ডটা ধনুকের মত বেঁকে যায়। দুটো নিদ্রাহীন আতঙ্কিত চোখ খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকে। একটা নির্লজ্জ কলম ক্লান্তিহীন মোসাহেবী আনন্দে পাতা ভরে ভরে এক বিচিত্র সততার অভ্যুদয়ের ইতিহাস লিখে যায়—অটলনাথের জীবনী। এ

ছাড়া আর কোন্ পথ আছে কান্তিকুমারের?

টেবিলের দু'পাশে দু'জনে মুখোমুখি বসে: অটলনাথ বললেন।—মেয়ে স্কুলের প্রাইজের বক্তৃতাটা একটু ফলিয়ে লেখ মাস্টার। আজকাল প্রগতির কথা যা'সব শুনছি, সেসব কিছু কিছু দিও। বেশ একটু আর্ট করে লিখবে রবিঠাকুরের মত।

কান্তিকুমার আরও কিছু স্পষ্টভাবে নির্দেশ পাবার জন্য উৎসুকভাবে অটলনাথের দিকে তাকিয়ে রইল। অটলনাথ বললেন।—বিয়ে ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন পথ নেই, এই কথাটা জোর দিয়ে বলতে হবে। সেই সঙ্গে বেশ কড়া করে নিন্দে করতে হবে—লোকে কেন ঘরে ঘরে ধিড়িঙ্গে আইবুড়ো মেয়ে পুষে রাখে? এটা অধর্ম্ম, এ'তে জাতিলোপ হবার আশঙ্কা আছে।

কান্তি।—যে আজ্ঞে।

অটলনাথ।—হ্যাঁ, আর একটি কথা লিখবে। পুরুষ অভিভাবক ছাড়া মেয়েদের গতি নেই। সেই অভিভাবক বাপই হোক্ বা স্বামীই হোক্ বা···বা যেই হোক্।

তেমনি নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছিল কান্তিকুমার। অটলনাথ আবার বললেন।—ভাষাটার দিকে একটু নজর রেখে লিখবে মাষ্টার। খারাপ করো না। অবিশ্যি, তোমার ভাষা যতই খারাপ হোক, আমি তা পড়ার গুণেই মাৎ করে দিই।

কান্তি।—যে আজ্ঞে।

অটলনাথ একবার পাশের ঘরে উঠে গেলেন। মিনিট পনর সেখানেই কাটলো। ফিরে এলেন যখন—তখন মুখের চেহারা বদলে গেছে। লালচে হয়ে গেছে, আগুনের আঁচ লাগলে যেমন হয়। চেয়ারে বসে ছেলেমানুষের মত উসখুস করতে লাগলেন অটলনাথ। কান্তিকুমারের

কাছে এই দৃশ্য একেবারে নতুন নয়। এক পাত্র স্কচ হুইস্কি পেটে পড়লে অটলনাথের হাবভাব এই পরিণত বয়সেও একটু দুরন্ত হয়ে ওঠে।

—কই, বক্তৃতাটা কিরকম লিখলে দেখি মাস্টার? একবার পড়ে শোনাও।

অটলনাথ সোফার ওপর শরীর এলিয়ে বসলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডিবেটা কান্তিকুমারের দিকে এগিয়ে দিলেন।—একটা তুলে নাও মাষ্টার, লজ্জা করো না। আমেরিকার ক্রোড়পতি মালিকও চাকরাণীর সঙ্গে নাচতে দ্বিধা করে না; আমি তো তোমাকে বিশুদ্ধ একটি সিগারেট দিচ্ছি। নাও, নিয়ে ফেল।

কান্তিকুমার একটি সিগারেট তুলে নিয়ে খাতাপত্রের এক পাশে রেখে দিয়ে লেখাটা পড়ে শোনালো।—আজ তোমরা ছাত্রী—কুমারী। কাল তোমরা গৃহিণী হইবে—মাতা হইবে। সেইতো জীবনের চরম সার্থকতা··· তোমরা সেই জগন্মাতার অংশ, যাঁহার করুণার স্তন্যক্ষীরধারায় নিখিল বিশ্বের জীব লালিত হইতেছে···বন্দে মাতরম্।

দু'ঠোঁটে লহু লহু হাসি। ঝুঁকে-পড়া মাথাটা সোজা করে তুলে ধরলেন অটলনাথ।—বাঃ, খুব কায়দা করে বেড়ে সব দেহতত্ত্ব ঢুকিয়ে দিয়েছ মাষ্টার! চমৎকার হয়েছে।

আহ্লাদে আপ্লুত স্বরে কথাগুলি বললেন অটলনাথ। কান্তিকুমার হাবা ছেলের মত হাঁ করে তাকিয়ে তার মর্ম্ম বোঝার জন্য বৃথা চেষ্টা করলো। চোখ বুঁজেই অটলনাথ আবার ডাকলেন।—মাস্টার!

কান্তি।—আজ্ঞে

—প্রতাপের বড় মেয়েটা বেশ বয়স্থা হয়েছে, নয় কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—প্রতাপের তো এমনিতেই পেট চলে না, মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য

ওর নেই। নয় কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের রাঁচী অফিসে প্রতাপকে একটা কাজ দিয়ে ওকে নিশ্চিন্ত করে দিলাম। গালার স্টোরের মেড়ো মুন্সীটাকে বিদেয় করে দেব, প্রতাপকে বসিয়ে দেব তার জায়গায়।

—মন্দ হয় না স্যার!

—প্রতাপ তো রাঁচী চললো। কথা হচ্ছে মেয়েটা! মেয়েটা কোথায় থাকবে? আপাততঃ আমার এখানেই থাকবে। কি বল মাষ্টার?

উদ্দাম কাশির মধ্যেই ফিক্ করে হেসে ফেললেন অটলনাথ।

—আর একটা সিগারেট নাও মাষ্টার। ডিবেটা সাগ্রহে কান্তিকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে অটলনাথ আবার বললেন।—প্রতাপটা যেন ঝড়ের আগে এঁটো পাতা। বলা মাত্র রাজী হয়ে গেছে। কালই কাজে জয়েন করতে চায়।

বলতে বলতে অটলনাথের গলার স্বর সুললিত হয়ে উঠতে লাগলো।
—মেয়েটাই বা কী কম যায়? এর মধ্যে চারটে চিঠি ছেড়েছে—তার সঙ্গে ডাক্তারখানার ওষুধের বিল, বকেয়া বাড়ী ভাড়ার হিসাব, কাপড় ওয়ালার বিল, স্যাকরার পাওনা…। চুকিয়ে দিয়েছি সব। অসুখ সারানো থেকে সুরু করে গয়না পর্যন্ত দিলাম! ব্যস্। মেয়েটা কিন্তু বাপের মত ততটা তোখোড় নয়।

আহত জানোয়ারের মত আচম্কা হিংস্র মূর্তি ধরে, একটা লাফ দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার। সামনের সোফার উপর পড়ে এক বৃদ্ধ অজগর যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে লালসায় কাতরাচ্ছে। মাথার ওপর প্রচণ্ড এক ছাতির বাড়ি দিয়ে এই অজগরের জীবনীর শেষ অধ্যায় এখুনি লিখে দিতে পারা যায়। কান্তিকুমারের মূর্তিটা দেখে তাই ভাবতে

ইচ্ছে করে। খুনী যেন ছুরি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু এই মূর্ত্তিতে কান্তিকুমারকে কেমন একটু বিসদৃশ মনে হয়—ছদ্মবেশের মত দেখায়।

অটলনাথ বললেন।—উঠোনা মাষ্টার। কথা আছে।

কান্তিকুমারের উদ্ধত মূর্ত্তিটা এই সামান্য একটি হুকুমের শব্দেই যেন ধীরে ধীরে চুপ্‌সে যেতে লাগলো। সতত সৎপথে চলা, কৃতজ্ঞতায় বাঁধা, পরোপকারে ডগমগ ও পুরস্কারপ্রীত একটি অতিভদ্রের পরবশ আত্মা ঘাড় গুঁজে চেয়ারের ওপর আবার স্থির হয়ে বসে পড়লো। এখন তবু কান্তিকুমারকে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়।

অটলনাথ বললেন।—প্রতাপ প্রথমে একটু চালাকী চেলেছিল। বলে কিনা—তার মেয়েকে বিয়ে কর, আমি নাকি সাক্ষাৎ শিব। আমি বললাম—তা হয় না। অন্নদাতা হিসেবে তার মেয়েকে রাখতে পারি, বিয়ে করতে পারি না। আচ্ছা এবার তুমি উঠতে পার মাষ্টার।

নির্দ্দেশমাত্র কান্তিকুমার যেন সুবাধ্য টাট্টুঘোড়ার মত তাড়া খেয়ে, খুট্ খাট্ খুরের শব্দ করে দরজার দিকে পা চালিয়ে চললো। অটলনাথ ডাক দিলেন আবার।—আর একটা কথা আছে মাষ্টার।

কান্তিকুমার দাঁড়ালো।

অটলনাথ বললেন।—বাণিজ্যবীর নামটা সুবিধের নয় মাষ্টার। আর ভাল লাগে না। ওটা বদ্‌লে দাও। এবার থেকে শুধু লিখবে—বাণিজ্য ঋষি।

হঠাৎ গোধূলি

ওদের দু'জনকে পাশাপাশি একসঙ্গে দেখলে কিছু-ক্ষণের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয়। জীবনের খাতায় অলকা আর প্রশান্ত দুটী কবিতার চরণের মত এসে মিলে গেছে। দুজনে পাশাপাশি থাকলে তবেই ওদের দুজনকেই এত সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালের জলভরা পুকুরের পাশে একটী পুষ্পিত ঝুমকো জবার গাছের মত, ওরা নিজের গুণেই যেন পরস্পরকে রূপ ধার দিয়ে এতটা সুন্দর করে মিলিয়ে নিয়েছে। নইলে শুধু একটা জলভরা পুকুর কীই বা এমন সুন্দর! একটা ঝুমকো জবার গাছের একলা রূপের মধ্যে তাকিয়ে দেখার মত কীই বা আছে!

বিয়ের পরেই আগ্রাতে বেড়াতে গিয়েছিল দু'জনে। তাজমহলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একটী আমেরিকান টুরিষ্ট আচম্বিতে সামনে এসে দাঁড়ালো। ইসারায় অনুরোধ জানালো—একটা মিনিটের জন্য একটু থেমে যেতে। ক্লিক্ ক্লিক্! উৎফুল্ল পাখীর মত টুরিষ্টের ক্যামেরা যুগল-রূপের দিকে তাকিয়ে একবার ডেকে উঠলো।

চৌরঙ্গীতে বাসের প্রতীক্ষায় ওরা দুজনে একটা ষ্টপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'একটা বেহায়া টমি একরোখা কেউটের মত শিষ দিতে দিতে এগিয়ে আসে। একেবারে সামনে এসে পড়তেই, অলকা ও প্রশান্ত একসঙ্গে তাকায়। কেউটে টমি চকিতে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। দূরে এগিয়ে গিয়ে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভীরু চোখ তুলে দেখে—কালা আদমির দেশের কোন শিল্পী যাদুকরের তৈরী একজোড়া ভ্রান্তি যেন পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু চেহারার জন্য নয়—শুধু গুণ মান শিক্ষা ও বিত্তের জন্য নয়, ওরা সব চেয়ে সুখী ওদের ভালবাসার জন্যই। এই ভালবাসাকে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন ছলনা আছে বলে ওরা বিশ্বাস করে না।

এই কারণে প্রশান্তের আত্মধারণা যদি তার মনের ভেতর একটী সুশোভন স্পর্দ্ধায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে, তবুও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। অলকা যদি আত্মবিশ্বাসে একটু বেশী সাহসী হয়ে উঠতে থাকে, তবে তাতে নিন্দে করার মত বিশেষ কিছু থাকতে পারে না।

প্রশান্ত এক এক সময়ে বলে।—অলকা, তুমি কল্পনা করতে পার, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি। আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, তার হাতটা এইরকম ভাবে তোমার গলা জড়িয়ে আছে?

অলকা প্রশান্তের হাতটা সজোরে টেনে নামিয়ে দেয়।—এরকম বিশ্রী কথা বলবে তো আমায় ছুঁতে পাবে না।

প্রশান্ত হাসতে থাকে। তার নিঃসংশয় পৌরুষের প্রসন্নতাকে অলকার কাছে, মাঝে মাঝে এইভাবে নেহাৎ রসিকতার ছলেই সে যাচাই করে নেয়। অলকা রাগ করে; কিন্তু প্রশান্তের বেশ লাগে।

প্রশান্তের একবার জ্বর হয়েছিল। একটী নার্স রাত জেগে প্রশান্তকে শুশ্রূষা করতো। নার্সটী দেখতে সুন্দর, তার ওপর ভদ্র আর লাজুক। ওষুধ খাওয়াবার সময় নার্স প্রশান্তের মাথাটা একটী হাত দিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরতো। আগ্রহ ভরা চোখ দুটো প্রশান্তের মুখের ওপর ঝুঁকে থাকতো। অলকা সবই দেখতো; তবু তার মনের কোণে কোন মেয়েলী অভিমানে একটুও অস্বস্তির খোঁচা লাগেনি। অলকার কাছে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অলকা জানে, প্রশান্তের মনে একতিল জায়গাও আর খালি পড়ে নেই। সব ঠাঁই জুড়ে বসে আছে স্বয়ং অলকা। ট্রামে বাসে অলকার চোখে কতবার কত সত্যিকারের রূপসী চোখে পড়েছে। অলকা দেখেছে, প্রশান্ত ভ্রূক্ষেপও করে না।

*

দেশ বিদেশের নাম-করা অ্যাথ্‌লেটদের ছবির একটা অ্যালবাম এনে প্রশান্ত অলকাকে দিল।—নাও, বসে বসে দেখ। এক একটী চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার।

অলকা অ্যালবামটা একবার উল্টিয়ে দেখেই টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়।—ভারি সব ছিরি! এসব দেখবার কোন গরজ নেই আমার, তোমার সাধ থাকে তুমি দেখ।

প্রশান্তর চোখে অদ্ভুত এক তৃপ্তির উদ্ভাস ফুটে ওঠে! এই রসিকতা-গুলি নেহাৎ তুচ্ছ—কিন্তু তার মধ্যে এক পরম বিশ্বাস বার বার পরীক্ষায় মাজাঘষা হয়ে খাঁটি সোনার মত আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই প্রশান্ত এত খুশী। প্রশান্তের ব্যক্তিত্ব অলকার সমাদরের জলবাতাসে সতেজ চারাগাছের মত উর্দ্ধে মাথা ঠেলে উঠছে। একটী সুন্দরী তরুণীর কাছে পৃথিবীর সব পুরুষ মিথ্যে হয়ে গেছে। রূপেগুণে ব্যক্তিত্বে ও প্রেমিকতায় সত্য হয়ে মাত্র একটী পুরুষ অলকার কাছে নিশ্বাসবায়ুর মত মনপ্রাণ ছেয়ে

আছে। সে হলো অলকার স্বামী প্রশান্ত। এই উপলব্ধি প্রশান্তের কথাবার্তায় ঠাট্টায় রসিকতায়—এক সবিনয় ঔদ্ধত্যের নেশা এনে দিয়েছে। প্রশান্ত সেটা বুঝতে পারে না বোধ হয়।

প্রশান্তকে যদি পুরুষোত্তম বলা যায়, তবে প্রশান্তের বন্ধু শঙ্করকে অপৌরুষেয় বলতে হয়। রোগা কালো টাকপড়া চেহারা, কপালের ওপর চার পাঁচটা বসন্তের দাগ। জীবন বীমার দালালি করে শঙ্কর—সামান্য রোজগার। লেখাপড়া হয়তো সামান্য কিছু জানে।

শঙ্করকে নিয়ে প্রশান্ত প্রায়ই রগড় করে। বিয়ের পর থেকে প্রশান্তের এই খেয়ালটা আরও বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে। শঙ্কর প্রায়ই সন্ধ্যার সময় প্রশান্তের বাড়ী একবার ঘুরে যায়। প্রশান্তের সঙ্গে অনেক পদস্থ ও সম্পন্ন লোকের জানাশোনা আছে। তাদের একটু বলে কয়ে দিলেই শঙ্কর দু'একটা জীবন বীমার মক্কেল পেয়ে যায়।

শঙ্কর করুণার পাত্র সন্দেহ নেই। প্রশান্ত তাই এই গরীব বন্ধুকে সাহায্য করতে কুণ্ঠা করে না। অলকাও তার যথাসাধ্য করে। চা-জলখাবার না খাইয়ে সে কখনো শঙ্করকে উঠতে দেয় না।

অলকা ও প্রশান্ত বেড়িয়ে ফিরে দেখে, শঙ্কর বৈঠকখানার ঘরে একা একা বসে আছে—রাত নটা বেজে গেছে যদিও। ওরা আসা মাত্র শঙ্কর গাত্রোত্থান করে। প্রশান্ত বলে—আরে এতক্ষণ যখন ধৈর্য্য ধরে বসেই আছ, তখন আর পাঁচটা মিনিট বসে যেতে দোষ কি ? বসো বসো।

অলকা প্রশান্তের একটা ইসারা বুঝতে পারে। একটা ডিসে কিছু খাবার সাজিয়ে এনে শঙ্করের সামনে রাখে।

এক একদিন প্রশান্তের মাথায় যেন রগড়ের ভূত এসে ভর করে। শঙ্কর ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তবু অদ্ভুত এক আহ্লাদে মাতাল হয়ে প্রশান্ত বলতেই থাকে।—যদি নেহাৎ বিয়ে করতে হয় শঙ্কর, তবে প্রেম

করে বিয়ে করবে। নইলে আমার মত পস্তাতে হবে।

পস্তাতে হবে! রঙ্গ করেই এত বড় একটা মিথ্যা না বলে নিলে প্রশান্ত যেন তার পরিণয়ে কৃতার্থ জীবনের সত্যটীকে চরম করে অনুভব করতে পারে না।

অলকা এসে ঘরে ঢোকে। প্রশান্তের রসিকতা আরও উদ্বেল হয়ে ওঠে।—তুমি জাননা অলকা, শঙ্কর এযাবৎ তিন তিনবার প্রেমে পড়েছে। ওর দোষ নেই। নায়িকারাই মরিয়া হয়ে ওর পেছনে লেগেছিল। শঙ্করের উপেক্ষায় একটী ভগ্ন-হৃদয় তরুণী তো আজ পর্য্যন্ত বিয়েই করলেন না।

সবই নিছক মিথ্যা, তৈরী করা কাহিনী মাত্র। শঙ্করের নগণ্যতার পাশে এই কাহিনীর ছবি যেমন বিসদৃশ তেমনি অসম্ভব মনে হয়। তবু এর মধ্যে প্রশান্ত কী যে আনন্দ পায় তা সেই জানে।

অপ্রস্তুত শঙ্কর সত্যিই লজ্জায় আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে। অলকা সামনে বসেই সব শুনছে—হয়তো সব বিশ্বাস করে ফেলবে। শঙ্কর প্রশান্তকে ধমকের সুরে আপত্তি জানায়।—কী সব বাজে বকছো প্রশান্ত। তোমার আর মাত্রাজ্ঞান নেই।

অলকার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে শঙ্কর চোখ নামিয়ে নেয়। অলকা শান্ত ভাবেই শঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌতুকে তার চোখ দুটী হাসতে থাকে। একটা অধঃপতিত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দূর নক্ষত্রের দরদের মত হাসিটা যেন মিটিমিটি জ্বলে।

প্রশান্ত একদিন বললো।—তোমার সৌভাগ্যের চন্দ্রকলা এতদিনে পূর্ণ হলো অলকা।

অলকা—কী হলো?

—তুমি মনে করেছ, শঙ্কর এখানে শুধু খাবার খেতে আর জীবন বীমার মক্কেলের খোঁজ নিতে আসে ?

—তা মনে করবো কেন ? তোমার বন্ধু মানুষ, তুমি ওকে ভালবাস তাই আসে।

—না গো বিশ্বমনোরমা, তোমাকেই দেখতে আসে।

—কী যে বল ! এসব বিদ্‌ঘুটে কথা আর শুনতে পারি না।

প্রশান্ত যেন এতদিনে তার কল্পনার মধ্যে আর একটা প্রচণ্ড প্রহসন আবিষ্কার করেছে। হাসি থামাতে পারে না প্রশান্ত।

প্রশান্ত প্রস্তাব করে।—একটা মজা করতে হবে অলকা। তোমাকে রাজী হতেই হবে।

অলকা একটু ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ভয় পাবার মত মন তো তার নয়।—আমাকে আবার কী করতে হবে ?

—তুমি শঙ্করকে একদিন প্রেম নিবেদন কর। আমি পাশের ঘরে থাকবো। আমি শুধু গবেটটার মুখের ভাবটুকু ষ্টাডি করবো। দেখি, ও কী বলে, কী করে !

অলকা বিরক্তির সঙ্গে প্রবলভাবে আপত্তি জানায়।—এসব কী কথা ! তোমার বন্ধুকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা রগড় কর, সেটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু আমি ওসব করতে যাব কেন ? ছিঃ।

—আরে, শুধু একটু থিয়েটারী ঢঙে অভিনয় করবে।

—কী করতে হবে ?

—বলবে ; শঙ্কর বাবু, আপনাকে আমি কত ভালবাসি তা আজও কি বুঝতে পারলেন না। আপনি হৃদয়হীন...।

অলকা ঘৃণায় ও লজ্জায় শিউরে ওঠে।—রামো রামো ! অভিনয় করেও কি এসব কথা বলা যায় ! তার চেয়ে বরং গুড ফ্রাইডের ছুটিতে

রাণু যখন এখানে আসবে, তোমরা শালী ভগ্নীপতিতে ষড়যন্ত্র করে শঙ্করকে নিয়ে যত খুসী মস্করা কর, আমি বাধা দেব না। রাণু নাকেমুখে কথা বলতে পারে—এসব ওই ভাল পারবে।

—রাণুকে দিয়ে এসব করালে আমার কা লাভ হলো? আমি যেটা এক্সপেরিমেন্ট্ করে দেখতে চাই, আসলে সেটাই হবে না।

অলকা বোকার মত তাকিয়ে রইল। আবার এক কোন্ খেয়াল নিয়ে মসগুল হয়ে আছে প্রশান্ত? না, প্রশান্তের প্রেমিকতার শ্লাঘা মনের ভেতর থাকলেই সুন্দর ছিল। যেটা নিঃসংশয়ে সত্য তাকে বারবার নানা তুচ্ছ প্রসঙ্গে খুঁটে খুঁটে যাচাই করার কোন অর্থ হয় না। অবশ্য এসব রগড় মাত্র। সেটা প্রশান্ত জানে, অলকাও বোঝে।

অলকা—বড় বেশী ছেলেমানুষী করছো তুমি। লোকটাকে নিয়ে ছিনিমিনি করে কী সুখ পাও বুঝি না। যাই হোক, আমি কিন্তু কথাগুলি বলেই পালিয়ে যাব। যা বলতে হবে লিখে দাও, মুখস্থ করে নেব।

একটা কাগজ টেনে নিয়ে লেখা শেষ করে প্রশান্ত বললো।—এই কথা ক'টা বলবে, শঙ্কর, প্রাণেশ আমার। আমার বাইশ বছর বয়সের সকল কামনা শুধু তোমাকেই যে লতার মত জড়িয়ে ধরতে চাইছে। ওগো চিতচোরা……।

অলকা লেখাটা পড়ে নিয়েই বললো—ভারি রগড় করছো! এসব ভাষা শুনলে কে না বুঝবে যে ভাণ করা হচ্ছে।

প্রশান্ত একটু সমস্যায় পড়ে আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দিল—হাঁ, কথাটা ঠিক। যাই হোক্ একটু উদ্‌ভ্রান্তের মত বলবে, তা হলেই শুনতে বেশ লাগবে। ঘাবড়ে যাবে।

বৈঠকখানাটা সেদিন সন্ধ্যায় এত ভাল করে সাজানো হলো কেন?

ফুলদানির ওপর এত বড় দুটো গন্ধরাজের তোড়া রাখবার কীইবা প্রয়োজন ছিল? একগুচ্ছ ধূপকাঠি পুড়িয়ে ঘরের বাতাস এত সুরভিত করেই বা কী হবে? প্রশান্ত অলকার দিকে তাকিয়ে উৎসাহে হাসতে লাগলো।—বাপ্‌রে, ঘরে যেন সত্যই রোমান্স থম্‌থম করছে।

শঙ্করের পায়ের শব্দ শুনে প্রশান্ত পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে গিয়ে বসলো।

বৈঠকখানার দরজা পর্য্যন্ত এসেই শঙ্কর থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলো—প্রশান্ত নেই?

অলকা—না, কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেলেন।

—কখন ফিরবে?

—আজ ফিরতে রাত হবে অনেক।

—আচ্ছা, আমি আজ তাহলে যাই।

—সে কি কথা? নতুন করে আপনাকে অনুরোধ করতে হবে নাকি? চা খেয়ে তারপর যাবেন।

চা-খাওয়া শেষ করে শঙ্কর একটা বই তুলে নিয়ে এক মনে পড়ে। অলকা উসখুস করে, ঘরের ভেতর আসে আর যায়, পাইচারী করে। চেয়ারের ওপর বসে কিছুক্ষণ, তারপরেই ছটফট ক'রে উঠে পড়ে। আলোর সামনে দাঁড়িয়ে একটু আড়াল করে মুঠো থেকে কাগজটা খুলে লেখাগুলি একবার পড়ে নেয় অলকা।

অলকা বললো—শঙ্কর বাবু।

শঙ্কর—বলুন।

দুটী মিনিট বৃথাই স্তব্ধ হয়ে রইল। অলকা মনে মনে কথাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলো।

অলকা—শঙ্কর বাবু, আপনি রোজই এখানে আসেন কেন?

শঙ্কর বই পড়া বন্ধ করে বিস্মিত হয়েই অপ্রস্তুতের মত বললো—আমার আসাটা কি আপনারা পছন্দ করেন না ?

—শুধু জিজ্ঞাসা করছি, কেন আসেন ?

—কাজের দায়েই আসতে হয়। প্রশান্ত দু'একটা পার্টির খোঁজ দেয় তাই। তা না হলে এত ঘন ঘন আপনাদের বিরক্ত করতে...।

—সেই সামান্য খোঁজ নিতে কতক্ষণ সময় লাগে? কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন কেন ? কী দরকার ?

—দরকার কিছুই নয়। আপনারা কিছু মনে করেন না বলেই বসে থাকি।

—তাই বলে কি রোজই আসতে হয়। রোজ এখানে আসতে এত ভাল লাগে আপনার ?

—তা, ভাল লাগে বৈকি! এত সজ্জন আপনারা।

পাশের ঘরের চাঞ্চল্য প্রকট হয়ে না পড়লেও, বোঝা যায় সেখানে অস্ফুট একটা প্রতিবাদ ফিস্‌ফাস্ করে উঠছে। মেজেতে প্রশান্তের জুতোটা দুবার ঘসা লেগে বেশ জোরে শব্দ করলো। নেপথ্য থেকে যেন কতগুলি সঙ্কেত অলকার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছিল—অভিনয় ঠিক হচ্ছে না।

অলকা বললো—আপনার বন্ধু সজ্জন হতে পারেন, কিন্তু আমাকেও প্রশংসা করছেন কেন ? আমি তো আপনার কোন উপকার করিনি !

শঙ্কর—বন্ধু তো সজ্জন হবেনই, তার জন্য তাকে প্রশংসা করার কী আছে ? বরং আপনি কেউ না হয়েও যতখানি...।

অলকা—কী ?

শঙ্কর—যতখানি খাতির করেন, আপন জনের মত কথা বলেন...।

অলকা—আমি খাতির করি ? আমি আপন জনের মত কথা বলি ? সত্যি বলছো শঙ্কর ?

তিন চার মিনিট ধরে ঘরের ভেতর একটা মূর্চ্ছাহত মৌনতার মধ্যে দেয়াল ঘড়িটা শুধু টিক্‌টিক্‌ করে বাজতে লাগলো। কৌতূহলের আবেগে উচ্ছল প্রশান্তের চোখ দুটো পর্দার আড়াল থেকে সহসা চোরা টেলিস্কোপের মত উঁকি দিল।

এক হঠাৎ গোধূলির ছোঁয়া লেগে বৈঠকখানার ঘরটা যেন অসম্ভব হয়ে আকাশ পটের মত দূরে সরে গেছে। শঙ্করের মুখটা যেন ছেঁড়া মেঘের মত ভাসছে। বসন্তের দাগগুলি তবু স্পষ্ট চিনতে পারা যায়! অলকা শঙ্করের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা রাত্রি শেষের চাঁদ যেন জঙ্গলের মাথায় সান্ত্বনার জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে।

অলকার গলার স্বরটা কানে কানে বলা কথার মত অস্পষ্ট।—এখানে আসতে ভাল লাগে শঙ্কর?

শঙ্করের ছোট ছোট চোখ দুটো আরোও ছোট হয়ে পিলসুজের পোড়া তেলের মত চিক্‌চিক্‌ করতে লাগলো।—হাঁ, ভাল লাগে।

অলকা বললো—রোজ এস, বেশ?

শঙ্কর চলে যাবার অনেকক্ষণ পরে অলকা বুঝতে পারলো, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে, পুঞ্জ পুঞ্জ সিগারেটের ধোঁয়া আসছে।

একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত বই পড়ছিল। অলকা ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢুকতেই প্রশান্ত বলে উঠলো—রংচুটা জমিয়ে তুলেছিলে বেশ, যাক্‌।

প্রশান্ত আবার বই পড়তে আরম্ভ করলো

অনধিকার প্রবেশ

বিকেল থেকে আকাশে মেঘ জমেছে একটু একটু করে। সন্ধ্যা হতে না হতেই জমাট অন্ধকারের ছায়া নেমে এল সহরের বুকে। বাদলা হওয়ার দমক আসছে হুহু করে দিগ্‌বিদিকের খেয়াল না রেখে, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি শুধু ছড়িয়ে দিচ্ছে পথচারীদের গায়ে। এমনি দিনে প্রিয়তোষ চলেছে হন হন করে একটা গলি দিয়ে। বর্ষারাতেও গলির মধ্যে চলেছে অবিরাম জনপ্রবাহ। ধাবমান জনতাকে পেয়ে বসেছে কি যেন একটা নেশার আমেজ। কত রকমের লোক, কে তার খবর রাখে? অন্ধকার বাড়িয়ে দিয়েছে গলির মর্য্যাদা। দিনের আলোয় সেখানে ডাক দিয়ে যায় বুড়ো ফিরিওয়ালা, ছন্দের টুংটাং তোলে কালীঘাট-ফেরৎ রিকশাওয়ালা।

বাড়ীগুলির বড় বড় নম্বর অন্ধকারে বেশ দেখা যাচ্ছে। সারা দিনের উদাস গৃহবীথিকা জেগে উঠেছে আনন্দের প্রমত্ততায়। এগারো নম্বরে প্রিয়তোষ ঢুকে পড়ল। সঙ্কীর্ণ ঘরে নোংরা মাদুরবিছান মেজেতে বসে

আছে একসার লোক। সামনের নড়বড়ে তক্তপোষে এক স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক পেঁয়াজ কুচিয়ে চলেছে। একটা লোক সকলের ফরমাসমত গেলাস, পেঁয়াজ, মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা এগিয়ে দিচ্ছে। দলের সবাইকে চেনে প্রিয়তোষ। পুলিন বাবু পানপাত্র হাতে স্থূলাঙ্গীর সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলছেন। অতুলবাবু পা ছড়িয়ে বসে আছেন, মুখে বিদ্রূপের হাসি। মুখে চোখে বড়মানুষী ভাব—স্বতঃসিদ্ধ রায়। গা-ঘেঁসে বসে আছে গ্যাস-মিস্ত্রী শিউশরণ আর জুটমিলের কুলী রমজান। যাঁরা লোকনিন্দার ভয় করেন, তাঁদের মুখ একবার জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভিড় কমলেই তাঁরা ঢুকবেন।

প্রিয়তোষ সফেন তাড়ির পাত্রে চুমুক দিচ্ছে একটু একটু করে। ঘর প্রায় খালি, মাঝে মাঝে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আধখোলা দরজা দিয়ে এসে সকলের ঝিমিয়েপড়া উৎসাহকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। রমজান মিয়া মিষ্টিগলায় গান ধরেছে,—'মেহেরবাণী হুস্‌ন্‌কী নয়াজোয়ানী দেখ্‌ কর্‌।' গেলাস হাতে প্রিয়তোষ চোখ বুঁজে স্বপ্ন দেখছে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে সারি সারি রুক্ষমূর্ত্তি খেজুর গাছ, তাদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা তাজা রস।—বাবুজী!

ঘরের বাইরে চাপাগলার আওয়াজে প্রিয়তোষের চমক ভাঙ্গল। ভিতরে তখন দুএকজন মাত্র রয়েছে। স্থূলাঙ্গী নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

মিনতিভরা কণ্ঠে আবার শোনা গেল,—বাবুজী, বাবুজী! বিষণের ডাক প্রিয়তোষকে ফিরিয়ে আনল স্বপ্নের আবর্ত্ত থেকে; সন্তর্পণে দরজা খুলে সে বাইরে এল। গলির দুপাশের বাড়ীগুলি অন্ধকারে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলার হঠাৎ-জেগে-ওঠা প্রাণ রাত্রির গভীরতার সঙ্গে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে।

অন্ধকারে ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে বিষণের দীর্ঘ মূর্ত্তি। কালি চাঁদের

মত গলির মোড়ে রাস্তার বাতিটা ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। বিষণ আর প্রিয়তোষ চলেছে সেই দিকে—অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠেছে তারা।

সে'রাতে অন্ধকারের ঢেউ যেন সহরের বুকে কালির বন্যা বইয়ে দিল। ঘন মেঘের পর্দা ধীরে ধীরে নেমে আসছে পৃথিবীকে ঢেকে দিতে। জনহীন রাস্তাগুলি অতিকায় সরীসৃপের মত পড়ে আছে অসাড়ে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে পথের ঠিকানা যেন থেকে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়তোষ চলেছে অন্ধের মত বিশ্বজগৎকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে। তালুকদার বাবুদের দেউড়ীতে একটার ঘন্টা বেজে গেল। তাদের পথচলা যেখানে শেষ হল, সেখানে তখন শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ। দুতিনখানা অ্যাম্বুলেন্স-কার দাঁড়িয়ে আছে, কুলিরা একটার পর একটা মুমূর্ষু লোক এনে গাদাগাদি করে রাখছে তার মধ্যে। একটা উগ্র ভাপসা গন্ধ ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে নাকে এসে লাগছে।

নোংরা বস্তি। তরকারীর খোসা আর ভাতের ফ্যান চারদিকে ছড়ান তার সঙ্গে কিছু কিছু ইঁদুরের নাড়ী ভুড়ি। বাড়ীওয়ালা ট্যাক্স্ দেয় বটে, কিন্তু ধাঙড়, মেথররা নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে সপ্তাহে এক দিন পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। বস্তির বাসিন্দা সকলেই সামান্য চাকুরে। [illegible]বাবু ছাপাখানায় কাজ করেন। গৌরবাবু কাজ করেন মাড়োয়ারীর গদিতে। ফটিকবাবু স্কুলে মাষ্টারি করেন। এছাড়া পরাণবাবু, হৃদয়বাবু, শীতলবাবু,—তিনজনেই ষ্টেশনে হকারি করেন। মা ষষ্ঠীর কৃপা সকলের ঘরেই আছে। সাতসিকে ভাড়ার আলোকবাতাসহীন ঘরে স্বামীস্ত্রী পাঁচসাতটি ছেলে মেয়েতে কোন রকমে রাতকাটান মাত্র হয়। মেয়েদের বিয়ে হয় না। আটহাত সরুপাড় কাপড় পরে, মাবাপের কড়া শাসনে তারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে; সুযোগ পেলেই বাইরে আসে, ছেলেদের দিকে তাকায় আর হাসে। ছেলেরা কোরা ধুতির ওপর নতুনকেনা পাঞ্জাবী চড়িয়ে ঘাড়

ছেঁটে বাপের ভয়ে কাজের চেষ্টায় বেরিয়ে যায়; বিকেল না হতেই ফিরে এসে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে।

বস্তির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঘরে থাকে প্রিয়তোষ। আড়াইটাকা ভাড়ার ঘরটিতে দরজা ছাড়াও দুটি জানলা আছে। প্রিয়তোষের পেশা গল্পলেখা। জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তার লেখাকে দিয়েছে এক অসহ্য সম্পদ। সে লেখার মধ্যে প্রেমের চিহ্ন নেই।

বিষণ' কোথা থেকে এসে জুটেছে প্রিয়তোষের সঙ্গে। একচোখ কাণা, সারামুখে বসন্তের দাগ, বুড়োকে দেখে তার মায়া হয়েছিল। তখন থেকে তার হাতেই সে তুলে দিয়েছে সংসারের ভার। প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল নেই। মাঝে মাঝে ফটিকবাবু আসেন খোঁজখবর নিতে। যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ সুরু হলে জিনিষপত্রের চড়া দামে এসে থেমে যায়। ফটিক বাবু বলেন, বস্তির পাট এবার উঠল ভায়া। বোমার ভয় আমার নেই। না খেয়ে শুকিয়ে মরাকেই আমার যত ভয়। আটটা বাজলেই তিনি বিদায় নেন। অন্ধকারে তাঁর শীর্ণ অভাবমলিন মূর্ত্তি মিলিয়ে যায়, প্রিয়তোষ একদৃষ্টে সে দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুপুরবেলা বস্তির গোলমাল অনেকটা থেমে যায়। ছেলেমেয়েদের বাপেরা ধুঁকতে ধুঁকতে কাজে বেরিয়ে যায়, অকালবার্দ্ধক্যে শীর্ণ মায়েরা ব্যবহারজীর্ণ যন্ত্রের মত একটার পর একটা সংসারের কাজ করে যায়। বড় মেয়েরা অন্ধকার ঘরের কোণে বসে ভয়ে ভয়ে অঙ্গের স্বাস্থ্য খুঁজে খুঁজে দেখে; ছোট ছেলেরা কলকাতার কাক তাড়ায়—খেলা করে।

আড়াইটাকার ঘরে বসে প্রিয়তোষ গল্প লেখে—তাদের বিষয়ে, যারা আড়াইকোটি টাকার মালিক, যারা প্রভুত্ব করে আড়াই লক্ষ লোকের ওপর। লিখতে লিখতে বিকেল হয়ে যায়, সে মুখ তুলে দেখে গৌর বাবুর মেয়েটা মিছামিছি হেসে চলে যাচ্ছে।

আজ রাতের ব্যাপার প্রকাশ পেল বিষণের মুখ থেকে। পরাণ বাবু সেদিন একটু সকাল সকাল ফিরছেন কাজ সেরে। বস্তির কাছাকাছি একটা অন্ধকার গলিতে বিড়ি ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালাতেই তিনি দেখলেন অদূরে গ্যাসপোষ্টের আড়ালে কারা লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বীরত্ব দেখাবার এমন সুযোগ পরাণবাবু ছাড়লেন না। হুঙ্কার দিয়ে অগ্রসর হতেই কে একজন সবেগে উধাও হয়ে গেল। আর একটা কাঠি জ্বালতেই থামের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে-যাওয়া বেপথুমতী বেলাকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। ডুরে শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে ব্লাউজ পরা, চোখে কাজল, পরিপাটী করে খোঁপা বাঁধা—আমতলা বস্তির গৌর সিংহীর মেয়ে বেলাকে আর চেনা যায় না।

পরাণবাবুর সঙ্গে বেলা'তো বাড়ী ফিরল। তার অভিসারের সঙ্গী শীতল বাবুর ছেলে গণেশ অন্ধকারে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। রাত দশটায় মাড়োয়ারীর কবলমুক্ত গৌরবাবু বাড়ী এসে হাঁপানিজীর্ণ দেহে যেন নতুন শক্তি ফিরে পেলেন। মেয়েকে ঘা'কতক দিয়ে তিনি দমকলের মত সবেগে গালাগালির তোড় ছাড়লেন শীতলবাবুর উদ্দেশে। শীতলবাবুও নিশ্চেষ্ট থাকবার পাত্র নন। তাঁর সোণার চাঁদ ছেলে নিরপরাধ। গৌরের মেয়ে শীঘ্রই বাজার তুলবে, এই সদম্ভ উক্তি তিনি করাতে হাতাহাতির সূত্রপাত হয়। বস্তির বাসিন্দারাও কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করলেন। হাতাহাতি, ক্রমে লাঠি দা নিয়ে মারামারিতে পরিণত হল। খবর পেয়ে অবিলম্বে ছুটে এল অ্যাম্বুলেন্স-কার; সুশীল বাবুরা সদলে যাত্রা করলেন হাসপাতালের দিকে।

সকলের অলক্ষ্যে প্রিয়তোষ নিজের ঘরে ফিরে এল। একটু পরে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই ভাঙ্গা কাঁসার মত ঝগড়াটে গলার শব্দে সে চমকে উঠল। সে শব্দে মধ্যরাত্রির ঘন অন্ধকার

যেন খান্‌খান্ হয়ে গেল। সুশীলবাবুর স্ত্রী সূতিকা জ্বরে ভুগে ভুগে অস্থি-চর্ম্মসার হয়েছেন, পরাণবাবুর স্ত্রী দুবছর থেকে ভুগছেন হার্টের অসুখে, শীতলবাবুর স্ত্রীর ফুসফুসে ক্ষয় ধরেছে। আজ রাতে কর্ত্তাদের রণতাণ্ডব তাঁদের চিত্তেও এনে দিয়েছে কুৎসিত এক কলহের প্রেরণা।

লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোর সামনে বসে লিখছে প্রিয়তোষ। বস্তির গৃহিণীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রস্থান করেছেন। গৌরবাবুর মেয়ের কান্না থেমে গেছে। লেখা থামিয়ে প্রিয়তোষ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে, কখন ভোরের আলো ফুটবে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে পুলিশের ভারী বুটের শব্দ, এঞ্জিনের বাঁশী আর রিকশার টুংটাং। ভোরের আলোয় দেয়ালে হেলান দিয়ে প্রিয়তোষ স্বপ্ন দেখছে, বেলা শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে, পরনে ডুরে শাড়ী, পরিপাটী করে খোঁপা বাঁধা।

এক একটা দিন করে বর্ষা কেটে গেল। আকাশের মেঘল ভাব কেটে গিয়ে নতুন রূপ বেরিয়ে পড়ল। আমতলা বস্তির নোংরা আবহাওয়ার ওপরেও শরতের সোণালী হাসির ছায়া পড়ল। বিবর্ণ খোলার চালে মেঘমুক্ত আকাশের নির্ম্মল রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, পাশের ডোবাটাতে ব্যাঙের একটানা ডাক গেছে থেমে। বস্তির প্রাণীদের বেসুরো জীবনেও যেন কার সোণার কাঠির ছোঁয়া লেগেছে। প্রায়ই দেখা যায় ফটিকবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে গুণ্‌গুণ্ করছেন, সুশীলবাবু কাজে যাচ্ছেন একটা টপ্পা গাইতে গাইতে। গৃহিণীদের রুক্ষ মুখেও প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠেছে।

এই কুড়িয়ে-পাওয়া আনন্দের ধাক্কা সামলাতে পারলেন না কেবল গৌর বাবু। একদিন কাজ থেকে ফিরে প্রবল কাশির দমকে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বিত্তহীনের ঘরে মরবার দিনেও ডাক্তার ডাকার কথা সহজে কারও মনে হয় না, ফিট হওয়া তো একটা সামান্য ব্যাপার।

সাবিত্রী মেয়ে বেলাকে ডেকে দিলেন বাপের মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করতে, জ্ঞান হলে রান্না তৈরী না দেখলে ক্ষুধার্ত্ত স্বামী অনর্থ ঘটাবেন।

বেলা হাওয়া করছে প্রায় আধঘণ্টা ধরে; মুদিতনেত্র গৌরবাবু নিঃশ্বাস ফেলছেন ধীরে ধীরে। ঘরের মধ্যে কুপী জ্বলছে, তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই হয়েছে বেশী। সুশীলবাবুরা ঘরের মধ্যে ভিড় করে বিজ্ঞের মত মন্তব্য করছেন। হৃদয়বাবু ছেলেবেলা স্বাস্থ্যরক্ষা পড়েছিলেন, বল্লেন,—ব্লটিং কাগজের ধোঁয়া গৌরের নাকে দাও! পরাণবাবু নাড়ী দেখে বল্লেন, অবস্থা ভাল নয়, গলির মোড়ে জ্ঞান কবরেজকে ডাকতে পাঠাও। ঘরের এককোণে সাবিত্রীর চাপাকান্না শোনা যাচ্ছে। অভুক্তভোগীরা নিম্নগলায় আশ্বাস দিচ্ছে। সুশীলবাবুর স্ত্রী বেলাকে দেখিয়ে বল্লেন,—ওই ডাইনীর জন্যই বাপের প্রাণটা গেল। রোগী দেখে প্রিয়তোষ কিন্তু চমকে উঠল। তার সাড়া পেয়ে বেলা মাথা নীচু করে আরও জোরে হাওয়া করতে লাগল। বিষণকে নিয়ে প্রিয়তোষ ছুটল ডাক্তার ডাকতে।

মাঝরাতে ডাক্তার পাওয়া শক্ত ব্যাপার। অনেক সাধ্যসাধনার পর এক নামকরা ডাক্তার তো আসতে রাজী হল। দক্ষিণা পঁচাশী টাকা। চৌষট্টি টাকা ফিএর ওপর রাতের মজুরী ষোল টাকা বেশী, আর পেট্রোল খরচ পাঁচ টাকা। ডাক্তার বল্লে—একশ টাকার কমে রাতে আমি নড়ি না মশায়, গরীব বলেই দিলাম কিছু ছেড়ে। টাকাটা যেন মারা না যায় দেখবেন। বস্তির লোকদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না।

ভিজিটের বহর শুনে প্রিয়তোষের মনটা একবার শঙ্কিত হয়ে উঠলেও সে তখনি সামলে নিল! তার মায়ের দুএকখানা হালকা গহনা তার কাছে তখনও আছে, ভাবী পুত্রবধূর জন্য তাঁর আশীর্ব্বাদ।

প্রিয়তোষ যা সন্দেহ করেছিল তাই হল। ডাক্তার বল্লে,—সন্ন্যাস, এ রোগ সারবার নয়।—প্রিয়তোষবাবু, আপনি আমাকে অনর্থক ট্রাবল

দিলেন। রোগ সারাতে না পারলেও টাকাটা গুনে নিতে ডাক্তার একটুও ইতস্ততঃ করল না। তার বিদায় নেওয়ার ঘণ্টাচারেকের মধ্যেই গৌরবাবুর মৃতদেহ নিয়ে সুশীলবাবুরা বেরিয়ে গেলেন।

গৌরবাবুর মৃত্যুতে বস্তির ওপর দিয়ে যেন একটা আচমকা আতঙ্কের ঝড় বয়ে গেল। কেবল শীতলবাবু শত্রুনিপাতে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে থেমে গেলেন, কারণ এক মাস পরেই তাঁর স্ত্রী শ্মশান যাত্রা করলেন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে। দুঃখময় সংসার চালনার ভারী যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে এল তাঁর বিস্ময়াহত দৃষ্টির সম্মুখে।

অলস মধ্যাহ্নের মত ম্লান জড়তা এসে আচ্ছন্ন করেছে প্রিয়তোষকে। এখন বেশীর ভাগ সময়ই সে ঘরে বসে আনমনে কাটায়। এগারো নম্বরে যেতে ভাল লাগে না। স্থূলাঙ্গীর স্থূল রসিকতা, নাকীসুরে আপ্যায়ন তাকে আর প্রলুব্ধ করে না। সন্ধ্যার একটু আগেই বস্তি ছাড়িয়ে দূরে পার্কে গিয়ে সে শুয়ে থাকে পামগাছের নীচে। চানাচুরওয়ালা হাঁক দিয়ে যায়, ভিখারী ছেলেমেয়ের গলাভাঙা গান কানে আসে। পার্কের ভিতর লাল সুরকীঢালা চওড়া রাস্তা, হাস্যকোলাহলে মুখর করে চলেছে সন্ধ্যা-বিহারিণী ভদ্রবাড়ীর মেয়েরা। পশ্চিম আকাশের লাল রং এসে লুটিয়ে পড়েছে তাদের বিচিত্র শাড়ীর গায়ে। প্রিয়তোষ ভাবে রামবাবুর মেয়ে সরুপাড় মোটা শাড়ী পরে এখন হয়ত রান্না চড়িয়েছে, আট হাত শাড়ী পরে বেলা হয়ত কলে জল ধরছে, ভিখিরি মেয়েগুলি এতক্ষণ উনুনে চাল ফুটিয়ে নিচ্ছে।

ঘরে এসে সারারাত প্রিয়তোষের কলম আর থামে না। বিষণ অনুযোগ করে, বলে,—এইবার বহুমাকে নিয়ে এস বাবুজী, আমি একলা আর পারি না। প্রিয়তোষ হাসে, কলম কিন্তু থামে না। খোলা জানলা

দিয়ে শিশিরভেজা হাওয়া আসে। লেখা থামিয়ে এক একবার সে প্রাণভরে নিশ্বাস নেয়, আর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার বস্তির প্রাঙ্গণে রুক্ষচুলেভরা করুণ মুখ হাওয়ায় ভেসে উঠছে না? প্রিয়তোষ অনুভব করে বেলা তার দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে।

যে উত্তম একদিন তাকে জীবনের পথে উৎসাহী পথচারী করে তুলেছিল, তার যেন সমাধি হয়ে আসছে। জগতের সর্ব্বত্র চলেছে সেই একই আহ্বান আর প্রত্যাখ্যান, দুরাশা আর আশাভঙ্গের অর্থহীন খেলা।

বস্তির ঘরখানি হ'য়ে উঠল তার শেষ আশ্রয়। সেখানে সে একটানা লিখে চলে তার নতুন লেখা, যা তার জীবনে কোনদিনই প্রকাশিত হবে না। শরতের মধ্যাহ্ন উত্তাপে প্রখর হয়ে ওঠে,—একটা বাজতেই জুটমিলের বাঁশীর আর্ত্তনাদ শোনা যায়। প্রিয়তোষ গৌরবাবুদের দরজায় চুপি চুপি ধাক্কা দেয়।

দরজা খুলে দেয় বেলা। সাবিত্রী বলেন,—এস বাবা। আসবাব-হীন ঘর, প্রিয়তোষ বসে একটা পিঁড়ি টেনে। বেলার কাজ শেষ হয় নি তখনও। ঝেড়ে মুছে ঘরটিকে সে তকৃতকে করে তোলে। লজ্জা, হাসি, অভিমান খেলা করে তার মুখে। প্রিয়তোষ কাগজে মোড়া একটা বাণ্ডিল সাবিত্রীর হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে যায়।

বস্তির [illegible] জীবন চলেছে একটানা গ্লানির টানে। মাঝে মাঝে সে তাল ভঙ্গ হয় গৌরবাবুর স্ত্রীর আর্ত্তবিলাপে, শীতলবাবুর সকরুণ আত্ম-অনুযোগে। নিরুদ্দিষ্ট গণেশের সন্ধান মেলেনি আজও। শোকাতুর পিতার কটূক্তি বর্ষিত হয় পরাণবাবুর উদ্দেশে।

প্রিয়তোষের সবচেয়ে ভাল লাগে [illegible]কে। পঁচিশ টাকা স্কুলের মাইনে ও টিউশনির দশ টাকায় নির্ভর করে তিনি তাঁর নিজের ও গৌর-বাবুর সংসারের ভার টানিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আড়াই টাকা মাইনেতে